রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

সম্পাদক
এ. এম. হারুন-অর-রশীদ

সংকলক ও সহযোগী সম্পাদক
সালাম আজাদ

বাংলা একাডেমী ঢাকা

রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

প্রথম প্রকাশ

বৈশাখ ১৩৭৭/মে ১৯৭১

পাণ্ডুলিপি

সংকলন উপবিভাগ

বাএ ৩৫০৩

(৯৬–৯৭ গসফো : সংকলন : ২)

প্রকাশক

আশফাক–উল–আলম

পরিচালক (চলতি দায়িত্বে)

গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক

ওবায়দুল ইসলাম

ব্যবস্থাপক

বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ ও বুক ডিজাইন

কাইয়ুম চৌধুরী

সূ চি প ত্র

রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী ৭–৮২

পরিশিষ্ট–এক

[জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী] ৮৩–১০৫

পরিশিষ্ট–দুই

[রবীন্দ্রনাথকে লেডি অবলা বসু] ১০৭

পরিশিষ্ট–তিন

[রবীন্দ্রনাথের লেখায় জগদীশচন্দ্র] ১০৯–১২৪

পরিশিষ্ট–চার

[রমেশদত্ত ও সিস্টার নিবেদিতার পত্র] ১২৫–১৩০

জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকার

এখন থেকে ঠিক একশ বছর আগে ডিসেম্বরের এমনি একদিনে জগদীশচন্দ্র বসু লন্ডনে বিজ্ঞানীদের সামনে বেতারে বার্তা প্রেরণ করে সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন। সেটাই বিজ্ঞানে বাঙালির যাত্রা শুরু। জগদীশচন্দ্র বসুই প্রথম বাঙালী বৈজ্ঞানিক যাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশকে বিজ্ঞানের অঙ্গনে সুপরিচিত করে তোলে। তিনি সেই পথিকৃতদের অন্যতম যাঁদের সম্বন্ধে আব্দুস সালাম বলেছেন এঁরা হলেন "বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং দলনেতা যাঁদের ঘিরে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান সমূহ তৈরি হয়।" ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তাঁর জন্মদিন এবং তাঁর ঠিক তিন বছর পর জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জগদীশচন্দ্র বসু এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দুই বাঙালী বাংলার সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে যে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তাকেই বোধহয় বলা হয় বাংলার রেনেসাঁ।

জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। তবু তিনি তাঁর পুত্রকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন একটি সাধারণ বাংলা স্কুলে যেখানে পুত্রের একপাশে বসত তার পিতার মুসলমান চাপরাশির পুত্র এবং অন্যপাশে বসত এক ধীবর পুত্র। মধ্যবিত্ত হিন্দু এবং নিম্নবিত্ত মুসলমান ঘরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এমনিভাবেই শুরু হয়েছিল পূর্ব বাংলার শিক্ষা জীবন।

নয় বছর বয়সে জগদীশচন্দ্র চলে এলেন কলকাতায় এবং ভর্তি হলেন প্রথমে হেয়ার স্কুলে এবং পরে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। ষোল বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে যেখান থেকে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। পরের বছর তিনি ইংল্যান্ডে গেলেন চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্যে।

আমাদের সৌভাগ্য যে জগদীশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত চিকিৎসাবিদ্যা আর শেখেননি। স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা বাদ দিলেন এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালের উৎসাহে তিনি কেমব্রিজের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে ভর্তি হয়ে গেলেন "বিজ্ঞান শেখার জন্যে।" কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রথমে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তিনি বি. এস. ডিগ্রী অর্জন করেন। বার বছর পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁকে ডি. এস্‌সি. ডিগ্রী প্রদান করে সম্মানিত করেন।

জগদীশচন্দ্র বসুই প্রথম ভারতীয় যিনি ইংল্যান্ড থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্তি লাভ করেন। কিন্তু তাঁর বেতন নির্ধারিত হল ইউরোপীয় অধ্যাপকদের দুই তৃতীয়াংশে। প্রতিবাদে জগদীশচন্দ্র বেতন নেয়াই বন্ধ করে দিলেন কিন্তু শিক্ষাদান তাঁর অব্যাহতই রইলো কেননা "অধ্যাপনা একটা সম্মান।" সরকার অবশ্য এক বছরের মধ্যেই তার ভুল বুঝতে পারে এবং জগদীশচন্দ্র বসুকে বকেয়াসহ পুরো বেতন দিয়েই তাঁকে সম্মানিত করে। সেদিন থেকে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে

অবসর গ্রহণের দিনটি পর্যন্ত সুদীর্ঘ তিরিশটি বছর তিনি ঐ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং সত্যেনবসু, মেঘনাদ সাহা, শিশির মিত্রের মতো ছাত্র তিনি তৈরি করতে পেরেছিলেন।

জগদীশচন্দ্র যে বছর প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন তার ত্রিশ বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হয় বার্লিনের বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় ভৌত-প্রযুক্তি গবেষণাগার। এখানেই পরবর্তীকালে পদার্থবিজ্ঞানের অনেক যুগান্তকারী মৌলিক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। যেমন কৃষ্ণবস্তুর বর্ণালীর উপর গবেষণা। এবং তারই ফলশ্রুতিতে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্ল্যাংকের কোয়ান্টাম তত্ত্বের আবিষ্কার। এর আগে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দেই বিজ্ঞানী হাইনরিখ্ হার্তস্ পরীক্ষাগারে প্রথম বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করেন যা বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ঠিক বাইশ বছর আগে তাত্ত্বিকভাবে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন।

জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অসাধারণত্ব এর থেকেই বোঝা যায় যে হার্তস্-এর আবিষ্কারের কিছু দিনের মধ্যেই সুদূর কলকাতায় বসে তিনি ঐ একই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং দ্রুত অভাবিত সাফল্য লাভ করেন। বিজ্ঞান গবেষণার কোন ঐতিহ্যই ভারতে ছিল না এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী কলকাতায় বিজ্ঞান গবেষণাগার বলতেও তেমন কিছু ছিল না।

কলকাতায় তখন তিনটি প্রতিষ্ঠানে আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু অংশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। প্রথমটি হল মেডিকেল কলেজ অব বেঙ্গল যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের চিকিৎসা বিদ্যায় টেকনিশিয়ান তৈরি করা। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারী প্রেসিডেন্সী কলেজ সেখানে জগদীশচন্দ্র বসু সারাজীবন অধ্যাপনা করে গিয়েছেন। এবং তৃতীয় যে প্রতিষ্ঠানের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় সেটি হল জেসুইট পাদ্রীদের পরিচালিত সেই সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে শিক্ষাদানের জন্য এই কলেজের যে সুনাম ছিল তার মূলে ছিলেন ফাদার অয়ারজন লাফোঁ। এই বেলজীয় পদার্থবিজ্ঞানী চল্লিশ বছর ধরে এই কলেজে শিক্ষাদান করেছেন এবং বাংলা তথা ভারতে বিজ্ঞান পথিকৃত হিসেবে নিঃসন্দেহে তাঁকেই চিহ্নিত করা চলে। ফাদার লাফোঁর প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং প্রদর্শনী কলকাতায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তিনি তাঁর ছাত্র জগদীশচন্দ্র বসুকে এক চিঠিতে লিখছেন,

"প্রিয় জগদীশ, আমি একটি উন্মুক্ত বক্তৃতা দিতে চাই যা হবে বেতার টেলিগ্রাফির উপরে। এই সুযোগে মার্কনীর উপরে তোমার অগ্রাধিকারের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ নিতে চাই।"

বেতার আবিষ্কার কে প্রথমে করেন— জগদীশচন্দ্র বসু না ইতালীয় বিজ্ঞানী গুইলিয়েমো মার্কনী? এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই যে সদ্য আবিষ্কৃত মাক্সওয়েল-হার্তস্-এর বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ নিয়ে পৃথিবীতে যে কয়েকজন মানুষ প্রথমে গবেষণা শুরু করেন জগদীশচন্দ্র বসু তাঁদের অন্যতম। বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি, বিদ্যুৎ-চৌম্বক সংকেত ধারণ এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক বর্ণালীর বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা এ সবই ছিল জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণার বিষয়। গবেষণার জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন ৫ মিলিমিটার থেকে ১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-চৌম্বব তরঙ্গ যা তিনিই প্রথম তৈরি করেছিলেন। তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে দ্বৈত প্রতিসরণের ফলে বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণের সমবর্তন আলোচিত হয় এবং এই প্রবন্ধটি

এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। এক বছর পর এই প্রবন্ধেরই পরিবর্ধিত রূপ রয়াল সোসাইটিতে প্রেরণ করেন লর্ড র‍্যালে। পরের কয়েকবছর জগদীশচন্দ্র বসু অর্ধ পরিবাহী বস্তু এবং আলোক বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা নিয়ে গবেষণা করেন।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে কর্মরত অবস্থায় জগদীশচন্দ্র বসু বেতারে বার্তা প্রেরণ করার এক ঘরোয়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। পরের বছর কলকাতার টাউন হলে তিনি একটি প্রকাশ্য সভায় ঐ বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি সর্ব প্রথম কঠিন দেয়ালের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের তারহীন প্রেরণ প্রমাণ করেন। এর ফলেই দ্রুত তাঁর খ্যাতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। ঐ বছরই ইংল্যান্ডের 'ইলেট্রিশিয়ান' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে বর্তমান সময়ে বেতারে বার্তা প্রেরণ করার যতগুলি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কৃত যন্ত্র তাদের সকলকে হারিয়ে দিয়েছে। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জগদীশচন্দ্র বসু রয়াল ইন্সটিটিউশনের এক সভায় বেতার বার্তা প্রেরণ প্রকাশ্যে দেখান। সভায় উপস্থিত ছিলেন লর্ড কেলভিন এবং আরো অনেকে। সুতরাং মার্কনীর অন্তত একবছর আগেই যে তিনি বেতার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন একথা আজ ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত সত্য। অবশ্য ব্যবসায়িক প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কনীর সাফল্য অনস্বীকার্য। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে তাই সম্ভবত জি. মার্কনী এবং এম. ব্রাউন "বেতার টেলিগ্রাফি"র জন্য নোবেল পুরস্কারে বিভূষিত হয়েছিলেন।

জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জীবন বোধহয় একই কারণে স্পষ্টভাব দুই ভাগে বিভক্ত। ১৮৮৪ থেকে ১৯০২ এই আঠার বছর জগদীশচন্দ্র বসু মূলত বেতার নিয়ে গবেষণা করেছেন। তারপর তিরিশ বছর তিনি ছিলেন জৈব-পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যাপৃত। ১৯০০ সালেই জগদীশচন্দ্র বসু জড় এবং জৈব বস্তুর মধ্যে সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের বিকিরণের শোষণ প্রক্রিয়ায় আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করলেন। পরবর্তী তিরিশ বছর তিনি নিরলসভাবে উদ্ভিদের শারীরতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন। এজন্যই জগদীশচন্দ্র বসুকে পৃথিবীর প্রথম জৈব পদার্থ বিজ্ঞানী বলা যায়। উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদকোষের আচরণ অনুসন্ধানের জন্যে জগদীশচন্দ্র কয়েকটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং নিখুঁত যন্ত্র তৈরি করেছিলেন যা দিয়ে উদ্ভিদের অতিক্ষুদ্র চাঞ্চল্যও বর্ধিত করে লিপিবদ্ধ করা যায়।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর গবেষণার ফল একত্রত করে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন যার নাম "জীব এবং জড়ে সাড়া" — Response in the Living and Non-Living। এই পুস্তকের মুখবন্ধে তিনি তাঁর নিম্নলিখিত প্রকাশিত প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন :

1. "De le Generalité les phénomenes Moléculaire Produits parl Electricial sur la matiere Inorganiqu eet sur is matiere Vivante" (Travaux du congrés International de physique, Paris, 1900)
2. "On the Similarily of Effect of Electrical stimulus on Inorganic and Living Substances" (Report, Bradford Meeting of British Association, 1900, Electrician)
3. "Response of Inorganic Matter to Stimulus" (Friday Evening Discourse, Royal Institution, May 1901)
4. "On Electical Response of Inorganic Substances. Preliminary Notice. (Royal Society, June 1901).

5. "On Electric Response of Ordinary Plants under Mechanichal Stimulus" (Journal of Linnean Society, 1902)
6. Sur La Reponse Electrique dans les Méture, les tissus Animaux et Végétaux", (Societe de Physique, Parise, 1902)
7. "On the Electro–Motion Wave accompanying Mechanical Disturbance ia Methls in Contact with Electrolyet" (Proceedings of the Royal Society, Vd, 70).
8. "On the Strain Theory of Vision and of Photographic Action" (Journal of Royal Photographic Society Vol, xxvi)

জগদীশচন্দ্র বসু যেসব উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন সেগুলি হলো :

শিকড় — গাজর, মূলা
কাণ্ড — জেরানিয়াম ফুল, দ্রাক্ষালতা
পত্রবৃন্ত — বাদাম, শালগম, ফুলকপি, শাক, ইউকারিস লিলি
পুষ্পবৃন্ত — এরাম লিলি
ফল — বেগুন

এই সব পত্র, পুষ্প, ফলের বৈদ্যুতিক সাড়া মাপার জন্যে তিনি স্বয়ং যে সব যন্ত্র তৈরি করেছিলেন সেগুলির কর্মক্ষমতা দেখলে এখনও একশবছর পরেও আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। বিক্রমপুরের গ্রামের সেই মেধাবী ছেলেটির যন্ত্রপাতি তৈরি করার হাত যে অসাধারণ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হলো জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিষয় এ সময়ে কি ছিল যাকে বলা হয়েছে tre jolie magnifique এবং যার ফলস্বরূপ "জয়সংবাদ পাইয়া নবমেঘগর্জ্জনপুলকিত ময়ূরের মত" রবীন্দ্রনাথের হৃদয় নৃত্য করেছিল? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

"য়ুরোপের মাঝখানে ভারত বর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিয়ো — তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিয়ো না। গ্যারিবাল্ডি যেমন জয়ী হইয়া রণক্ষেত্র হইতে কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তেমনি তোমাকেও অভ্রভেদী জয়তোরণের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের গভীর নির্জনতার মধ্যে দারিদ্র্যের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে — তখন তোমাকে সকলে খুঁজিয়া লইবে তুমি কাহাকেও খুজিবে না — তখন তোমার কাছে আসিতে ভারতবর্ষের কাছে সকলে মাথা নত করিবে — বিদেশী ছাত্রকে ডাকিবার জন্য বিদেশের প্ল্যানে প্রাসাদ রচনা করিলে চলিবে না —– মাঠের মধ্যে কুটীরের মধ্যে মৃগচর্ম্মে যে বসিবে সেই তোমাকে পাইবে।"

কবির এই কল্পনা অবশ্য সার্থক হয়নি — "তোমাকে সকলে খুঁজিয়া লইবে তুমি কাহাকেও খুঁজিবে না", এই আশাও পূরণ হয়নি। এর কারণ কি?

জগদীশচন্দ্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল জীবতত্ত্ব থেকে শুরু করে মধ্যবর্তী উদ্ভিদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে অজৈব ধাতু পর্যন্ত জীব ও জড়ের মধ্যে আসলে কোন বিভাজন রেখা নেই এটা প্রমাণ করা।

জগদীশচন্দ্র তাঁর পুস্তকে লিখছেন,

"উদ্দীপনা (stimulus) জীবন্ত বস্তুতে এক ধরনের উত্তেজক পরিবর্তন সৃষ্টি করে। যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তা কখনও কখনও দৃশ্যমান আকারে পরিবর্তন হিসেবে প্রকাশ পায় যেমন

পেশীর আকার পরিবর্তন। কিন্তু অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে যেমন স্নায়ু বা অক্ষিপটে কোন দৃশ্যমান পরিবর্তন হয় না কিন্তু উদ্দীপনের ফলে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তা এক ধরনের বৈদ্যুতিক পরিবর্তন হিসেবে প্রকাশিত হয়। যেখানে যান্ত্রিক সাড়াদান প্রয়োগের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ সেখানে এই বৈদ্যুতিক সাড়া সর্বজনীন।"

জীবকোষের উত্তেজনা বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক সাড়াদানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় এবং তা তার শারীরবৃত্তিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। বিশেষ শর্তের অধীনে জীবকোষকে সাড়াদানের অবস্থা থেকে সাড়াহীন অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায়। সেটা সাময়িকভাবে অনুভূতিনাশক দিয়ে করা যায় অথবা স্থায়ীভাবে বিষ প্রয়োগে করা যায়। এইভাবে স্থায়ী সাড়াহীন অবস্থায় নিয়ে এলে বলা হয় যে জীবকাষটিকে হত্যা করা হয়েছে। এই পরীক্ষণলব্ধ ফলে অর্থাৎ জীবকোষকে হত্যা করা হলে তা সাড়াদানের অবস্থা থেকে সাড়াহীন অবস্থায় চলে যায়। "মৃত" বস্তুর সঙ্গে জড় বস্তুর এই একীকরণের ফলে ধরে নেয়া হয় যে জড় বস্তুর কোষ হলে তা অবশ্যই সাড়া হীন হবে অথবা উত্তেজনা আরোপ করলেও তাকে উত্তেজিত করা সম্ভব হবে না। জগদীশচন্দ্র মনে করেন যে এই অনুমান ভিত্তিহীন।

কারণ ব্যাখ্যাহীন উত্তেজনার ধারণা থেকে ভেরওয়ার্ন (Verworn)-এর ভাষায় প্রাণশক্তির (vitalism) ধারণা শুরু হয় যা জড় এবং জৈব প্রকৃতির মধ্যে একটা দ্বৈতবাদ দাবী করে। প্রাণশক্তিতে বিশ্বাসীরা যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক ব্যাখ্যা মোটামুটি বাদ দিয়ে একটা সর্বনিয়ন্ত্রণকারী দুর্জ্ঞেয় এবং রহস্যময় অতিযান্ত্রিক বলের ধারণা প্রবর্তন করেন। জড়বস্তুর সব প্রতিভাসের জন্যে রাসায়নিক এবং ভৌত বল দায়ী হলেও প্রাণশক্তিতে বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে একটা বিশেষ প্রাণসত্তার বল সক্রিয় যা সব জৈবনিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে।

জগদীশচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টা ছিল এটা প্রমাণ করা যে জড় এবং জীবের সাড়াদানের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এখানে কোন রহস্য বা খামখেয়ালীপনার ভূমিকা নেই যা অতিযান্ত্রিক প্রাণশক্তির তত্ত্বে অনুমান করতে হয় এবং যা ভৌত আইনের বিপরীতে বা বিরুদ্ধে কাজ করে। জগদীশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত হল এই যে সাড়াদানের সব প্রতিভাসের ঘটনায় যার মধ্যে ধাতু, উদ্ভিদ এবং প্রাণী অন্তর্ভূক্ত তার কোন কিছুর মধ্যে আমরা কোন পার্থক্যের প্রমাণ পাই না। সুতরাং সাড়াদানের প্রতিভাস থেকে বলা যায় যে প্রাণশক্তির অনুমানের কোন প্রয়োজন নেই। আসলে এসবই শারীরবৃত্তিক বা রাসায়নিক প্রতিভাস যা ভৌত পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করা যায় এবং যা জড় ও জীব উভয় ক্ষেত্রেই একইভাবে সুনির্দিষ্ট।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে আগস্ট জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন,

"এই দেখ এইমাত্র একটি আশ্চর্য এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করিয়া আসিলাম। জন্তু এবং অজীবের মধ্যে ভয়ানক মস্ত একটা ব্যবধান, তাই সেতু বাঁধিবার.জন্য উদ্ভিদের জীবন স্পন্দন রেখা আছে কিনা তার আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছিলাম।"

এক জীববিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কোন কঠিন ধাতুতে চিমটি কাটিয়া তাহার অনুভূতি চিহ্ন যদি দেখাইতে পারেন তাহা হইলে দ্বিধা থাকে না।" জগদীশচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি এক নূতন যন্ত্র তৈরি করেছেন যা দিয়ে এই চিমটি কাটার ফলে যে অনুভূতিরূপ স্পন্দন সৃষ্টি হয় তা আপনা আপনি লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। তাঁর ভাষায়,

"জীবনের স্পন্দন যেরূপ নাড়ী দ্বারা বোঝা যায়, সেইরূপ জড়েরও জীবনী শক্তির স্পন্দন আমার কলে লিখিত হয়।"

কি এমন সেই যন্ত্র যা জগদীশচন্দ্র তৈরি করেছিলেন? তাঁর পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন,

"আকৃতির পরিবর্তনের মাধ্যমে সাড়া দৃশ্যমান প্রকৃতি হয়তো সবচেয়ে সুন্দরভাবে অনুসন্ধান করা যায় একখণ্ড পেশীতে। এটিকে চিমটি দিলে অথবা এর মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠালে, এটা ছোট এবং চ্যাপ্টা হয়ে যায়। এইভাবে সাড়া জনিত একটা বিকৃতি সৃষ্টি হয়। এর পর উত্তেজক অবস্থা চলে যায় এবং পেশী অংশটি আবার তার সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসে।"

যান্ত্রিক লিভার লিপিবদ্ধকরণ যন্ত্র : পেশীর সংকোচনের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুত এবং বিকৃতিটা এত অল্প সময়ের জন্য ঘটে যে, সাধারণ উপায়ে তা পুঙ্খানুপুঙ্ক রূপে দেখার ব্যবস্থা করা যায় না। একারণে একটা মায়োগ্রাফিক যন্ত্রের ব্যবস্থা করতে হয় যা দিয়ে পেশীর পরিবর্তন আপনা আপনি লিপিবদ্ধ হয়। এভাবে পরিবর্তন এবং পরিবর্তন থেকে ফিরে আসার ইতিহাস আমরা পেয়ে যাই। একটা লিখন লিভারের এক প্রান্তে পেশীটি সংযুক্ত করা হয়। পেশীটি সংকুচিত হলে, অংকন কলমের শীর্ষে একদিকে টান পড়ে, ধরা যাক তা ডান দিকে। টানের বিস্তার নির্ভর করে সংকোচনের পরিমাণের উপর। অংকন কলমের গতির উলম্ব

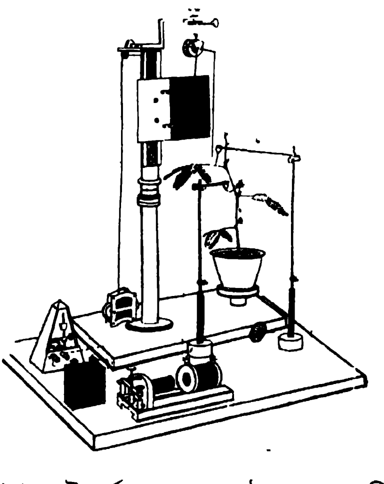

দিকে একখণ্ড কাগজ অথবা একটা ঘূর্ণমান ড্রামের পৃষ্ঠতল সুষম গতিতে চলমান। উত্তেজনা অবসানে পেশী যখন পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে, সে তার পূর্বের আকৃতিতে ফিরে যায় এবং অংকন বিন্দুটি এখন বাম দিকে সরে গিয়ে প্রথম অবস্থায় এসে এই পূর্বাবস্থায় ফেরার ব্যাপারটি চিত্রিত করে। এভাবে একটি লেখচিত্র বর্ণিত হয় যার উঠতি অংশটি সংকোচনের জন্যে এবং নামার অংশটি পূর্বাবস্থায় ফেরার জন্যে। লেখচিত্রের y–এর অক্ষরেখা সাড়ার তীব্রতা এবং x-অক্ষরেখা সময় প্রকাশ করে।"

জগদীশচন্দ্র এই সহজ সরল যন্ত্র দিয়ে স্নায়ুতন্ত্র, উদ্ভিদ এবং ধাতুর ক্ষেত্রে সুষম সাড়া অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁর একটি লেখচিত্র দেখানো যায় :

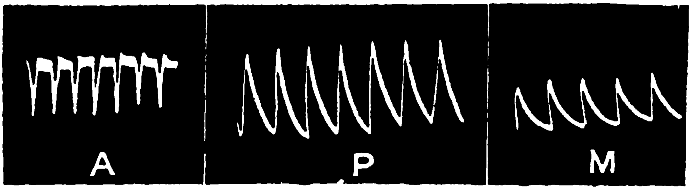

জীব উদ্ভিদ ধাতু

এ ধরনের লেখচিত্র থেকে জগদীশচন্দ্র সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে জীব, উদ্ভিদ এবং ধাতুর সাড়াদানের মধ্যে মৌলিক পর্যায়ে কোন পার্থক্য নেই।

১৯০১ সালের ২১শে মে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন,

"পৃথিবীর সর্বত্র চিমটি কাটবার যে উপায় তুমি বের করেছ সেইটে পড়ে গর্ব অনুভব করা গেল। একদিন জড় পদার্থ আমাদের বিধিমতে পীড়ন করে আসছিলেন। এবার তোমার কল্যাণে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারব। তাদের দেদার চিমটি কাট, আর বিষ খাওয়াও, ওগুলোকে কোন মতে ছেড়ো না। এখন থেকে আদালতে যদি অপরাধী জড়পদার্থের বিচার হয় তাহলে বিচারক তাদের চিমটি দণ্ড বিধান করতে পারবে।"

রবীন্দ্রনাথ আধা রসিকতার সঙ্গে একথা লিখলেও বন্ধুর উপর আস্থা ছিল তাঁর অসীম। ১৯০১ সালে ৩রা জুলাই তিনি লিখেছন,

"আমি সাহসে ভর করিয়া ইলেকট্রিশ্যান প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রাবণের বঙ্গদর্শনের জন্য তোমার নব আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি।"

রবীন্দ্রনাথের আশা ছিল যে জগদীশচন্দ্রের এই গবেষণা পৃথিবী বিখ্যাত হবে এবং দেশের সুনাম হবে। হয়তো আশা করতেন যে তাঁর এই কাজের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পাবেন যে পুরস্কার বেতার আবিষ্কারের সময়ে তাঁর পাওয়া উচিত ছিল। তিনি ১৯০১ সালে লিখছেন,

"যে ঈশ্বর তোমার দ্বারা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন আমি তাঁহার চরণে আমার হৃদয়কে অবনত করিয়া রাখিয়াছি। কোন্ দিক দিয়া তিনি আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অদ্য আমি তাহার অরুণাভামণ্ডিত পথ দেখিতেছি।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সে আশা পূরণ হয়নি। বাংলার রেনেসাঁর ইতিহাসে এই দুই বন্ধুর অকৃত্রিম ভালবাসা একটা মর্মস্পর্শী প্রোজ্জ্বল অধ্যায়। পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ মানুষকে যে কোন পর্যায়ে উঠাতে পারে রবীন্দ্রনাথ আর জগদীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ।

অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের টানে রবীন্দ্রনাথ যাই বলুন না কেন জগদীশচন্দ্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক বৈজ্ঞানিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্যই পেশীর অংশ বা ধাতুর মধ্যে আনবিক গঠনের দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে কারণ প্রকৃতির সব কিছুই অনু–পরমাণু দিয়ে গঠিত। সুতরাং আণবিক পর্যায়ে সাড়ার মধ্যে সাদৃশ্য থাকবেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে জীব এবং জড়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রাণের অস্তিত্বই এই দুই বস্তুর মধ্যে পার্থক্য এবং প্রাণের কোন পারমাণবিক ব্যাখ্যা দেয়া আজো সম্ভব নয়।

১৯৩৭ সালে জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"প্রাণ–পদার্থ থাকে জড়ের গুপ্ত কুঠুরিতে গা–ঢাকা দিয়ে। এই বার্তাকে জগদীশ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পাকা করে গেঁথে দেবেন এই প্রত্যাশা তখন আমার মনের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়েছিল — কেননা যা কিছু চলছে তা প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান। কিন্তু সেই স্পন্দন যে প্রাণ স্পন্দনের সঙ্গে একক বিজ্ঞানের প্রমাণ ভাণ্ডারের মধ্যে জমা হয়নি। সেদিন মনে হয়েছিল আর বুঝি দেরি নেই।"

অবশ্য জগদীশচন্দ্রের লেখা থেকে এটাও বোঝা যায় যে তিনি জড়েরও প্রাণ আছে একথা কখনও বলতে চাননি। তিনি লিখেছেন,

"সুতরাং জীবনের সাড়া তার বিভিন্ন প্রকারের মধ্য দিয়ে যেমনভাবে দেখা যায় তা শুধু অজৈবের মধ্যে সাড়ার পুনরাবৃত্তি মাত্র। এখানে কোন রহস্য বা খেলালীপনা নেই যেমন বলা হয় একটা অতিযান্ত্রিক প্রাণশক্তি (vital force) বস্তু–জগতে সক্রিয় তা সব আইনের ঊর্ধ্বে বা বিপরীতে কাজ করে। আমরা দেখেছি যে সাড়া সংক্রান্ত প্রতিভাসের জন্যে প্রাণশক্তি অনুমানের কোন প্রয়োজন নেই। আসলে এগুলি ভৌত রাসায়নিক প্রতিভাসমাত্র যা অন্য যে কোন অজৈব বস্তুর মতো ভৌত অনুসন্ধানের মাধ্যমে বোঝা যায়।"

প্রকৃতিকে বোঝার জন্যে ভৌত আইনই যে যথেষ্ট, এর মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের, প্রেরিতজ্ঞানের কোন অবকাশ নেই একথা জগদীশচন্দ্রের মতো এমন স্পষ্ট করে আর কেউ বলেননি। তাঁর বক্তব্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষণের মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। এটাই তাঁর মহত্ত্ব এবং এ কারণেই উপমহাদেশে তিনি পরীক্ষণ বিজ্ঞানের জনক বলে সম্মানিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

"আজ তুমি একলা দাঁড়িয়ে তোমার মানসপদ্মের বিজ্ঞান সরস্বতীকে দেশের হৃদয়পদ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছ। তোমার মন্ত্রের গুণে, তোমার তপস্যার বলে দেবী সেই আসনে অচলা হবেন এবং প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে তাঁর ভক্তদের নব নব বর দান করতে থাকবেন।"

রবীন্দ্রনাথের এই আশা কতটা পূরণ হয়েছে তা বাংলাদেশে সাম্প্রতিকতম ইতিহাস থেকে বলা মুস্কিল। তবু একথা ঠিক যে বহু চড়াই–উৎরাই পার হয়ে বিজ্ঞান আজ উপমহাদেশে নিজস্ব একটা স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে যার জন্য জগদীশচন্দ্রের মতো পথিকৃতরাই দায়ী। আমরা উত্তরাসূরীরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

জগদীশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের এই পত্রগুলি সংগ্রহ করেছেন স্নেহভাজন সালাম আজাদ এবং তিনি যত্ন করে টীকাগুলিও লিখে দিয়েছেন। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মনসুর মুসা এবং উপপরিচালক জনাব ওবায়দুল ইসলামের বিশেষ অনুরোধে এই বইটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে আমি রাজী হয়েছিলাম। কিছু কিছু চিঠিতে সম্পূর্ণ পারিবারিক প্রসঙ্গ

থাকায় তা আমি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আশা করি পাঠকের কাছে জগদীশচন্দ্রের চিঠিগুলির মাধ্যমে সব বিজ্ঞানী যে অনন্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন তার একটা মর্মস্পর্শী ছবি ফুটে উঠবে। বিজ্ঞানীর সংগ্রামের আনন্দ–বেদনার সাফল্য–ব্যর্থতার ইতিহাস এই পত্রগুলির মধ্যে যেমন ধরা পড়েছে তেমনটি আর কিছুতেই সম্ভব হতো না এবং এটাই নিঃসন্দেহে আমাদের বাঙালীর বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য। বাঙালীর বিজ্ঞান সাধনা অক্ষুণ্ন থাকুক এটাই আমাদের প্রার্থনা।

এই পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে প্রফেসর মনসুর মুসা, জনাব শামসুজ্জামান খান এবং জনাব ওবায়দুল ইসলাম প্রথম থেকে আমাদের সর্বতোভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। আমরা তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আশা করি এই পত্রসম্ভারের মধ্যে দিয়ে বাংলার রেনেসাঁর ইতিহাসের দুই কালজয়ী প্রতিভার অক্ষয় স্বাক্ষর আমাদের নতুন প্রজন্মকে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করবে।

পত্রাবলী প্রসঙ্গে

জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের গোড়াপত্তন ঘটে এক গুচ্ছ ম্যাগনোলিয়া ফুল দিয়ে। ১৮৯৬ সনে জগদীশচন্দ্র সার্থক বৈজ্ঞানিক সফর শেষে দেশে ফিরে এলে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের ১৩৯নং ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়িতে এক গুচ্ছ ম্যাগনোলিয়া ফুল নিয়ে বিজ্ঞানীকে অভিনন্দন জানাতে আসেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বাড়িতে না থাকায় তিনি ম্যাগনোলিয়াগুচ্ছ জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে রেখে আসেন এবং সেই থেকে রবীন্দ্র–জগদীশের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের শুরু। তাঁদের বন্ধুত্ব সম্পর্কে ১৩৩৩ সালে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'চলা আর পথ বাধা এই দুই উদ্যোগের সব্যসাচিতায় জীবন ছিল সদাই চঞ্চল। এমন সময় জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনিও তখন চূড়ার উপর ওঠেননি। পূর্ব উদয়াচলের ছায়ার দিকটা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন। কীর্ত্তি–সূর্য্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলেননি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয়। কিন্তু নিজের শক্তি স্ফূরণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে আনন্দ সে যেন যৌবনের প্রথম প্রেমের আনন্দের মতো আগুনে ভরা, বিঘ্নের পীড়নে দুঃখের তাপে সেই আনন্দকে আরো নিবিড় করে তোলো। প্রবল সুখদুঃখের দেবাসুরে মিশে অমৃতের জন্য যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি। বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না।'

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে অবস্থানকালে জগদীশচন্দ্র প্রায়ই এখানে আসতেন। তিনি সাধারণত শনিবার শিলাইদহে আসতেন। সাপ্তাহিক ছুটি কাটিয়ে আবার সোমবার ফিরে যেতেন কলকাতায়। সঙ্গে থাকতেন তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী লেডী অবলা বসু। মৃণালিনী দেবী আর লোডী অবলা বসু মিলে দিনের বেলায় রান্না করতেন নানা রকম ব্যঞ্জন আর মিষ্টান্নদি। সন্ধ্যায় সকলে বোটে চড়ে বসতেন। স্রোতের টানে নৌকা আর সুরের টানে ভেসে চলতো শ্রোতাদের মন। জগদীশচন্দ্রের প্রিয় গানগুলি ফিরে ফিরে গাইতে হতো রবীন্দ্রনাথকে। কখনো লেডী অবলা বসুকে। এসব হতো গরমকালে। শীতকালে ছিল আরেক বৈচিত্র্য। শীতকালে পদ্মাচরে অস্থায়ী ডেরা গড়ে তুলতেন রবীন্দ্রনাথ। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে রান্নার, স্নানের ঘর তৈরি হতো। বোটে থাকবার জায়গা। এখানে পাচক থাকতো রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বাবুর্চি গফুর মিয়া।

জগদীশচন্দ্রের দিবানিদ্রার অভ্যাস ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি দিবানিন্দ্রা। দিবানিন্দ্রায় যাবার আগে জগদীশচন্দ্রের দাবী থাকতো ঘুম থেকে ওঠে একটি নতুন লেখা শুনবেন। অথবা শিলাইদহ আসার আগে কলকাতা থেকে খবর পাঠাতেন, শিলাইদহ পৌছে প্রতিদিন একটি নতুন গল্প শুনবেন, রবীন্দ্রনাথ বন্ধুর এসব দাবী রক্ষার্থে লিখেছেন প্রচুর গল্প, কবিতা, গান। এভাবে জগদীশচন্দ্রের কল্যাণে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে সংযোজন ঘটেছে প্রচুর গল্প কবিতা গান ও প্রবন্ধের। জগদীশচন্দ্র মহাভারতের তাঁর প্রিয়চরিত্র কর্ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে লিখিয়েছেন 'কর্ণকুন্তী

সংবাদ' নামে আর একটি অমূল্য কবিতা। তাছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ক কোন প্রবন্ধ লেখার সময় জগদীশচন্দ্রের পরামর্শ ও সাহায্য নিতেন রবীন্দ্রনাথ। বিভিন্ন রকম সুগন্ধি তেল ও সাবান ব্যবহার করার আগে তিনি জগদীশচন্দ্রের অনুমোদন চাইতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কথা' কাব্য উৎসর্গ করেছেন জগদীশচন্দ্রকে, জগদীশচন্দ্রও নিজের লেখা ইংরেজি বই উৎসর্গ করেছেন বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে। "The nervous Mechanism of Plants" বইটির উৎসর্গপত্রে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন, 'To my long friend Rabindranath Tagore' বিলাতে থাকাকালীন সময় জগদীশচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখা অনুবাদ করে সে দেশের পত্রপত্রিকায় ছাপাতেন। রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানাতেন নতুন লেখা ছাপা হলে তার কপি পাঠাতে। বিলাতে থাকাকালীন সময় জগদীশচন্দ্র আর্থিক সংকটে পড়লে গবেষণা বন্ধ করে দেশে ফিরে আসা স্থির করলে রবীন্দ্রনাথ নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে এবং রাজা-মহারাজাদের দরবারে এক রকম ভিক্ষা করে জগদীশচন্দ্রকে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথের আর্থিক সাহায্য পেয়ে জগদীশচন্দ্রের পক্ষে পুনরায় গবেষণা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। আর সে গবেষণার ফলাফল তাঁকে এনে দিয়েছিল বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

কলকাতা ও দার্জিলিং-এ বসতো তাঁদের ঘরোয়া আড্ডা। এই আড্ডায় ঘন্টার পর ঘণ্টা দু'বন্ধুতে আলোচনা করতেন সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমসাময়িক বিশ্ব প্রসঙ্গ নিয়ে।

ভারতবর্ষে বিজ্ঞান গবেষণার পথকে সুগম করে দেয়ার উদ্দেশ্যে জগদীশচন্দ্র কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন বসু বিজ্ঞান মন্দির (BOSE INSTITUTE)। তিনি এই বিজ্ঞান মন্দিরের কমিটিসমূহে বরীন্দ্রনাথকে একাধিক পদ দিয়ে তাঁদের গভীর বন্ধুত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে তার পরিচালনা পরিষদের সহসভাপতির আসনে বসিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্রকে। এই প্রসঙ্গে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বিশ্বভারতীকে এবার সাধারণের হাতে সমর্পণ করে দিচ্ছি। তোমাকে এর ভাইস প্রেসিডেন্টের আসনে বসাতে চাই। সম্মতি লিখে পাঠিয়ো। সময় যদি পাও এই সূত্রে কাজের যোগও ঘটবে। . . .'

জগদীশচন্দ্র শান্তিনিকেতনকে আরো ব্যাপক আকারে গড়ে তোলার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন সময় চিঠির মাধ্যমে ও মৌখিকভাবে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন। সাধ্যমত আর্থিক সাহায্যও দিয়েছেন। মৃত্যুর বছরখানেক আগেও বিশ্বভারতীর উন্নতিকল্পে জগদীশচন্দ্র আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানাগার জগদীশচন্দ্র নিজের গবেষণার জন্যে ব্যবহার করেন, এটা কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হচ্ছিল না। কর্তৃপক্ষের এই অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি শুধু উৎকন্ঠা প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ করেননি। জগদীশচন্দ্রের জন্যে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠাকল্পে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। এই প্রসঙ্গে মহিমচন্দ্র দেব বর্মণ তাঁর 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থে লিখেছেন, 'একদিন রবিবাবুর তলবে জগদীশচন্দ্র বাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পরিলাম, প্রাইভেট কার্যে বিজ্ঞানাগার ব্যবহার কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে ... । রবিবাবু ইহাতে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন। বিশেষতঃ বুঝিলেন জগদীশচন্দ্র বসুর নিজের গবেষণাগার না হইলে তাঁহার বিজ্ঞানের নতুন

তথ্য আবিষ্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। পরামর্শ হইল ২০,০০০ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। ১০,০০০ টাকা রবিবাবু নিজের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন। বাকি টাকার জন্য ত্রিপুরার দরবারে ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইবেন।'

রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে যে সংবর্ধনা জানানো হয়। সে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন জগদীশচন্দ্র। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক'। আর রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের ৭০তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'ভাবীকালের চিত্তে তোমার স্মৃতির সঙ্গে আমার স্মৃতি জড়িত হয়ে থাকবে এই আমার আনন্দ।' শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতী এবং জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কর্মধারায় ব্যস্ত থাকতেন। যোগাযোগ হতো খুব কম। কিন্তু জগদীশচন্দ্র প্রতিদিন বন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনে ঘুমাতে যেতেন। লেডী অবলা বসু রামানন্দ চট্টোপাধায়কে এক পত্রে লিখেছিলেন, "জীবনের শেষ বৎসরেও উনি (জগদীশচন্দ্র) প্রত্যহ গ্রামোফোনে কবির স্বর 'আজি হতে শত বর্ষ পরে' শুনিয়া শয়ন করিতে যাইতেন।"

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু কবি বন্ধু রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় লাভ করেছিলেন একটি উজ্জল সাহিত্যিক দৃষ্টি। আর রবীন্দ্রনাথকে তিনি অভিষিক্ত করেছিলেন একটি জাগ্রত বিজ্ঞান চেতনায়। জগদীশচন্দ্র তাঁদের বন্ধুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার সমুদয় চেষ্টার মধ্যে আমি কখনও একা ছিলাম না। আমরা উভয়েই অপ্রসিদ্ধ ছিলাম, তখন আমার চিরবন্ধু রবীন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে ছিলেন। সেই সব সংশয়ের দিনেও তাঁহার বিশ্বাস কোনদিন টলে নাই।'

এই দুই বাঙ্গালী মহাপুরুষ তাঁদের বন্ধুত্বের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। পরস্পরকে লেখা তাঁদের চিঠিসমূহ বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ, চিঠিগুলি বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ, উর্বর। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'জগদীশচন্দ্র বসু' শীর্ষক জীবনী গ্রন্থটির পান্ডুলিপি তৈরি করার উদ্দেশ্যে কাজ করার সময় প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্র বসুর এই চিঠিগুলি ১৯৯৪ সালে মির্জা ফাহ্‌মিদা আজিমের সহযোগিতায় আমার হাতে আসে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকায় এই চিঠি গুলি ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ থেকে পৌষ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সাথে রবীন্দ্রনাথকে লেখা লেডী অবলা বসুর দু'টি চিঠিও প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল, সেখান থেকে নির্বাচিত একটি চিঠি এই গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে।

'বন্ধ তুমি ধন্য' এই তিন শব্দের পত্রটি জানুয়ারী ১৯৯৫-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে কলকাতার রবীন্দ্রসদন সংলগ্ন তথ্যকেন্দ্রে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাযজ্ঞের উপরে যে প্রদর্শনী হয়েছিল সে প্রদর্শনী থেকে সংগ্রহ করেছি।

চিঠিগুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ স্বল্প সময়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক, বিভাগীয় পরিচালক ও সংকলন উপবিভাগের উপপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পাণ্ডুলিপি বাংলা একাডেমীর সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দেয়ার পর অগ্রজ প্রতিম এবং বাংলা একাডেমীর উপপরিচালক জনাব ওবায়দুল ইসলামের পরামর্শে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী অধ্যাপক এ.এম হারুন-অর-রশীদ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই পত্রাবলীর

জন্যে একটি ভূমিকা লিখে দিতে এবং সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম ব্যবহার করার অনুরোধ জানালে তিনি সম্মতি প্রদান করেন। তাঁর এই সম্মতি আমাকে গৌরবান্বিত করেছে এবং যথেষ্ট ব্যস্ততার মধ্যেও মূল্যবান সময় ব্যয় করে তিনি জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকার' শিরোনামে ভূমিকা লিখে দেয়ায় এই গ্রন্থের গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সালাম আজাদ

ঢাকা
ফাল্গুন ১৪০৩

পত্র-পরিচয়

তখন অল্প বয়স ছিল। সামনের জীবন ভোর বেলাকার মেঘের মত ; অস্পষ্ট কিন্তু নানা রঙে রঙীন। তখন মন রচনার আনন্দে পূর্ণ ; আত্ম-প্রকাশের স্রোত নানা বাঁকে বাঁকে আপনাতে আপনি বিস্মিত হয়ে চলেছিল ; তীরের বাঁধ কোথাও ভাঙচে কোথাও গড়চে ; ধারা কোথায় গিয়ে মিশ্‌বে সেই সমাপ্তির চেহারা দূর থেকেও চোখে পড়েনি। নিজের ভাগ্যের সীমারেখা তখনো অনেকটা অনির্দ্দিষ্ট আকারে ছিল বলেই নিত্য নূতন উদ্দীপনায় মন নিজের শক্তির নব নব পরীক্ষায় সর্ব্বদা উৎসাহিত থাক্‌ত। তখনো নিজের পথ পাকা করে বাঁধা হয়নি ; সেইজন্যে চলা আর পথ বাঁধা এই দুই উদ্যোগের সব্যসাচিতায় জীবন ছিল সদাই চঞ্চল।

এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনিও তখন চূড়ার উপর ওঠেননি। পূর্ব্ব উদয়াচলের ছায়ার দিকটা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্ত্তি-সূর্য্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলেনি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয়। কিন্তু নিজের শক্তিস্ফূরণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে আনন্দ সে যেন যৌবনের প্রথম প্রেমের আনন্দের মতই আগুনে ভরা, বিঘ্নের পীড়নে দুঃখের তাপে সেই আনন্দকে আরো নিবিড় করে তোলে। প্রবল সুখদুঃখের দেবাসুরে মিলে আমৃতের জন্য যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি।

বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না। তার পরে যখন মধ্যাহ্নকাল আসে তখন বিপুল সংসার মানুষকে দাবী করে বসে। তখন কা'র কাছে কি আশা করা যেতে পারে তা'র মূল্যতালিকা পাকা অক্ষরে ছাপা হয়ে বেরোয়, সেই অনুসারে নিলেম বসে, ভীড় জমে। তখন মানুষের ভাগ্য অনুসারে মাল্যচন্দন, পূজা-অর্চ্চনা সবই জুটতে পারে ; কিন্তু প্রথম পথযাত্রীর রিক্তপ্রায় হাতের উপর বন্ধুর যে করস্পর্শ নির্জ্জন প্রভাতে দৈবক্রমে এসে পড়ে, তার মত মূল্যবান আর কিছুই পাওয়া যায় না।

তখন জগদীশ যে চিঠিগুলি আমাকে লিখেছিলেন তার মধ্যে আমাদের প্রথম বন্ধুত্বের স্বতোচিহ্নিত পরিচয় অঙ্কিত হয়ে আছে। সাধারণের কাছে ব্যক্তিগতভাবে তার যথোচিত মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু মানব মনের যে ইতিহাসে কোনো কৃত্রিমতা নেই, যা সহজ প্রবর্ত্তনায় দিনে দিনে আপনাকে উদঘাটন করেছে, মানুষের মনের কাছে তার আদর আছেই। তা ছাড়া, যাঁর চিঠি তিনি ব্যক্তিগত জীবনের কৃষ্ণপক্ষ পেরিয়ে গেছেন, গোপনতার অন্ধ রাত্রি তাঁকে প্রচ্ছন্ন করে নেই, তিনি আজ পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত। সেই কারণে তাঁর চিঠির মধ্যে যা তুচ্ছ তাও তাঁর সমগ্র জীবন-ইতিবৃত্তের অঙ্গরূপে গৌরব লাভ করবার যোগ্য।

এর মধ্যে আমারও উৎসাহের কথা আছে। প্রথম বন্ধুত্বের স্মৃতি যদিচ মনে থাকে, কিন্তু তার ছবি সর্ব্বংশে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে না। এই চিঠিগুলির মধ্যে সেই মন্ত্র ছড়ানো আছে যাতে করে সেই ছবি আবার আজ মনে জেগে উঠ্‌ছে। সেই তাঁর ধর্ম্মতলার বাসা থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের নির্জ্জন পদ্মাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বন্ধুলীলার ছবি। ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে পারিবারিক অবরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। আমার

জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে। আমার চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বের ক'রেছিলেন যেমন ক'রে শরতের শিশির–স্নিগ্ধ সূর্য্যোদয়ের মহিমা চিরদিন আমাকে শোবার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছে। তাঁর মধ্যে সহজেই একটি ঐশ্বর্য্য দেখেছিলুম। অধিকাংশ মানুষেরই যতটুকু গোচর তার বেশি আর ব্যঞ্জনা নেই, অর্থাৎ মাটির প্রদীপ দেখা যায়, আলো দেখা যায় না। আমার বন্ধুর মধ্যে আলো দেখেছিলুম। আমি গর্ব্ব করি এই যে, প্রমাণের পূর্ব্বেই আমার অনুমান সত্য হয়েছিল। প্রত্যক্ষ হিসাব গণনা ক'রে যে শ্রদ্ধা, তাঁর সম্বন্ধে. আমার শ্রদ্ধা সে জাতের ছিল না। আমার অনুভূতি ছিল তার চেয়ে প্রত্যক্ষতর ; বর্তমানের সাক্ষ্যটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ ক'রে ভবিষ্যৎকে সে খর্ব্ব ক'রে দেখেনি। এই চিঠিগুলির মধ্যে তারই ইতিহাস পাওয়া যাবে, আর যদি কোনো দিন এরই উত্তরে প্রত্যুত্তরে আমার চিঠিগুলিও পাওয়া যায়, তাহ'লে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারবে।*

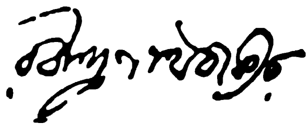

২২ চৈত্র, ১৩৩২

প্রবাসীতে এই চিঠিগুলো যখন ছাপা হয় জগদীশচন্দ্র বসু তখন পরলোকে। রবীন্দ্রনাথ 'পত্র পরিচয়' নামে এই ভূমিকাটি প্রবাসীর জন্যে লিখে দিয়েছিলেন। প্রবাসীর জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সংখ্যায় 'পত্র পরিচয়' প্রকাশিত হয়েছিল।

৮৫ নং অপার সার্কুলার রোড
২ রা মার্চ্চ ১৯০০

সুহৃদ্বরেষু

শুনিলাম, পরিবারের অসুখ বলিয়া আপনাকে শিলাইদহ যাইতে হইয়াছে। আশা করি আপনাদের সর্ব্বথা কুশল। সেদিন লোকেনের সহিত কবিতা নির্ব্বাচন লইয়া অনেক কথা হইল। যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে inartistic লোকেনের প্রিয় কোন কবিতা থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না। যাঁহারা অতিমাত্রায় আধুনিকত্ব দেখিয়াছেন, তাঁহাদের সেকেলে পুরাতন ও সরল,-সকল art এর মূলে স্থিত, কতকগুলি স্নেহবৃত্তি ও স্মৃতি সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। জানি না কেন সে সব এত আকর্ষণ করে। লোকেন বলিল, আপনি তাহার নিকট Unconditional আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। তাহা হইলে আর বলিবার কিছু নাই।

গত মঙ্গলবার দিন Belvedere-এ* গিয়াছিলাম। Sir. J. Woodburn* আমার জয়ের কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং আগামী সোমবার দিন Laboratory-তে আসিয়া experiment দেখিবেন ও আমার ছাত্রদিগের কার্য্য দেখিবেন বলিয়া দিলেন। আপনারা আমার Paris Congress-এ যাওয়া উচিত বলিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহ দেখিয়া আমি সেকথা বলিলাম, আর যে নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে সেকথা উল্লেখ করিলাম। Lt. Governor বলিলেন যে তিনি যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য করিবেন, তবে এ বিষয় Secretary of State-এর হাত।

গত সপ্তাহ আমার বিশেষ উৎসাহে গিয়াছিল, আর আজ কোন নূতন experiment আশাতীতরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং সেই মুহূর্ত্তেই Director-এর নিকট হইতে পত্র পাইলাম যে— **"I am informed an interview with the Lt. Governor and have asked to be deputed to Paris Exn., to attend a meeting of European Scientists. May I ask you to inform me of the reasons for making your request to His Honor ?"**

---

* **Belvedere : তৎকালীন ছোটলাটের বাসভবন**

* **Sir J. Woodburn : বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও দার্শনিক, তিনি ভারতের ছোটলাট ছিলেন।**

এরূপ দুরাশা করিবার reason কি, ইহার Explanation কি দিতে হইবে জানি না।

আমাদের কর্ম্মফল অনেক এবং অনেক দুরাশা আমাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত করে।

কতদূর মন সঙ্কীর্ণ করিতে হইবে? কতদূর কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিতে হইবে? ইহার শেষ কোথায়। আপনি এসব শুনিয়া কষ্ট পাইবেন জানিয়াও না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোন্ দিন কোন্ অপ্রত্যাশিত পতন আছে জানি না।

আর এক কথা। আপনারা আমার সম্বন্ধে যে interest লইয়াছেন তাহা আমার না জানিলেই ভাল হইত, কারণ এ সম্বন্ধে information তলব হইলে আমার কি বলিতে হইবে জানি না। আর এক সময়ে যে অনেক কাজ করিবার আশা করিয়াছিলাম, তাহা আমার দ্বারা যে হইবে এমন আশা করি না। অনেকগুলি বিষয়ের সূত্র ধরিয়াছিলাম ; সে-সবগুলি এখন পাক লাগিয়া গিয়াছে। সেগুলির পুনর্ব্বার উদ্ধার হইবে কিনা বলিতে পারি না।

সে যাহা হউক আপনাদের স্নেহ স্মরণ থাকিবে এবং তাহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পুরস্কার।

আপনি ত্রিপুরা যাইতেছেন। মহারাজাকে[১] আমার সসম্মান সম্ভাষণ জানাইবেন। আমি ছুটী পাইলে আসিতাম। ছুটী পাইলাম না। সেই Cross এর একটি ফল ত্রিপুরা পাঠাইব। আপনি মহারাজাকে দেখাইবেন।

আপনার
শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

---

১ **মহারাজা : ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্য।**

কলিকাতা
৬ ই মার্চ্চ ১৯০০

সুহৃদ্বরেষু

এ কয়দিন বড় ব্যস্ত ছিলাম। এজন্য লিখিতে পারি নাই। আমি এ কয়দিন 'মেঘ ও রৌদ্রের' মধ্য দিয়া গিয়াছি। মেঘের মধ্যে রজতরেখা কখন কখন দেখা দিয়াছে। সেই যে চিঠি তলব হইয়াছিল, তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে L.G.অনেককাল হইতে আমার কার্য্যে একটু একটু উৎসাহ দান করিয়াছেন। এজন্য আমার কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হইতে পারে তাহার জন্য আমার নিবেদন জানাইয়াছি। ইতিমধ্যে Sir J. Woodburn আমার Laboratory-তে আমার experiment দেখিতে আসিয়াছিলেন। কি কারণে জানি না, বাজারে রাষ্ট্র যে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমার নিকটও বিশেষ সন্তোষ ও Experiment দেখিয়া আশ্চর্য্যভাব প্রকাশ করিলেন ; এবং বলিলেন যে আমার ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্যই তিনি কতকগুলি Scholarship সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আরও বলিলেন আমি যাহাকে মনোনীত করিব তাহাকে ১০০ টাকা করিয়া ৩ বৎসর বৃত্তি দিবেন। আমাদের Principal এসব দেখিয়া একটু আশ্চর্য হইয়াছেন এবং আমার উপর একটু ভাল ভাব দেখাইয়াছেন। আর Director লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে 'তুমি আমার চিঠি ভুল বুঝিয়াছ' ! ! 'Governor তোমাকে পারিস পাঠাইতে চান। এ বিষয় report চাহিয়াছেন, এ সম্বন্ধে তোমার সহিত আলাপ করিতে চাহি।' আজ গিয়াছিলাম। প্রথম প্রথম বড় Stiff এবং formal ; তারপর excited হইয়া বলিলেন, যে 'এসব অতি আশ্চর্য্য, আমি আমার বন্ধু দু'একজনকে এসব দেখাইতে চাহি, কবে Laboratory-তে আসিলে সুবিধা হইবে,' ইত্যাদি !

বড় উৎসাহিত দেখিলাম, আর এসব যে অতি important একথাও বলিলেন। তবে পারিস যাইবার কথা উঠিলে দেখিলাম পূর্ব্ব ভাব অল্প অল্প ফিরিয়া আসিতেছে। বলিলেন যে ইহার পরে গেলে হয় না? 'The only difficulty is that there is no one who can take up your work during your absence, the college will suffer,' etc. আমি যে ইতিপূর্ব্বে গিয়াছিলাম এবং তখনও কলেজ এক প্রকার চলিয়াছিল, একথা জানা থাকিতেও যখন আপত্তি করিলেন, তখন আমি আর কি করিব? তারপর বলিলেন যে, Send me

your letter of invitation from Paris and I will send a repot। বলিতে লজ্জিত হইতেছি যে সেই নিমন্ত্রণ-পত্র অনেকদিন আমার পকেটে থাকিয়া সম্ভবত হয়ত ধোপাবাড়ী গিয়াছে— অন্ততঃ আমি খুজিয়া পাইতেছি না। এরূপ অবস্থা কিরূপ শোচনীয় মনে করিতে পারেন। আমি বলিলাম, 'যদি পাঁচ সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে পারেন, তবে নূতন একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র হাজির করিতে পারি।' কিন্তু সেই চিঠি এখন না হইলে নাকি চলিবে না। যাওয়ার কোন সম্ভব দেখিতেছি না। গত Mail-এ আমার Royal Societyর এক Paper ছাপা হইয়া আসিয়াছে Electrician কে সেই কাগজের একখানা copy পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহার কাগজে লিখিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ জানাইয়াছিলাম। ভয় ছিল যে ইহাতে editor দুঃখিত হইবেন। নিম্নলিখিত extract হইতে বুঝিবেন যে তাহারা generous হইতে পারে।

'I am delighted with the most interesting and lucid abstract of your royal Society Paper. The Subject is of such extreme interest, both scientifically and practically, at the present time, that I Hope to be able to give prominence to the abstract at an early issue. I am writing to the Secretaries of the Royal Society to obtain their sanction to the publication of your abstract.

'I sincerely trust that your energetic effort to improve the physical department of the Presidency College is meetig with great success. I hope that the authories are more favourable disposed than heretofore, to the extension of higher Scince teaching. Should there be any matter which it would be of utility to publish in the '*Electrician*', I should be very pleased if you will let me have early information about it.'

আমি সম্প্রতি একটি অত্যাশ্চর্য্য কৃত্রিম চক্ষু প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই চক্ষে অনেক আলো দৃষ্ট হয় যাহা আমরা দেখিতে পাই না। তা ছাড়া ইহা রক্তিম ও নীল আলো অতি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা Slightly green-bling। আপনার চক্ষু ইহা কি করিয়া অনুকরণ করিল বুঝিতে পারি না।

আমার দৃষ্টি সম্বন্ধে theory-র যাহা একটু অসম্পূর্ণতা ছিল এই কৃত্রিম চক্ষু তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারিবে। ইহার আশ্চর্য্য developement হইতে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। তবে তাহা সম্পূর্ণ করিতে সময় পাইব কিনা জানি না।

আমার শরীর মন একটু অবসন্ন আছে। আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সুখী হইব। আপনি যদি শিলাইদহে থাকেন তবে শুক্রবার দিন রাত্রে এখান হইতে রওয়ানা হইব। শনিবার দিন সকালে পৌঁছিব। রবিবার দিন বৈকালে ফিরিয়া আসিব। সোমবার দিন ছুটী পাই তাহা হইলে আর একদিন থাকিব। যা যা করিয়াছি, আপনাদের ওখানকার শান্তির মধ্যে থাকিয়া লিখিয়া লইব।

যদি শুক্রবার দিন না আসিতে পারি তবে Telegram করিব। নতুবা শুক্রবার দিন আসাই স্থির। যদি পারেন তবে এক লাইন লিখিবেন।

আপনার

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

পুঃ দুজন Scholar নিযুক্ত করিয়াছি।

কলিকাতা
১৬ ই মার্চ্চ ১৯০০

সুহৃৎ

আপনার চিঠি ও পুস্তক পাইলাম। সেই লেখাটি ইতিমধ্যে পড়িয়াছি। পরে দীর্ঘ চিঠি লিখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখনই দু'এক কথা লিখিতেছি।

আপনার লেখাতে অনেক বিজ্ঞান--সম্মত মত দেখিলাম। Sympathetic vibration কতদূর পাঠান যাইতে পারে তাহা বলা যায় না। এতদিন জড় জগতে এই নিয়ম আবদ্ধ ছিল, কিন্তু আমার নূতন কার্য্যে জানিতেছি যে চেতন ও অচেতনের মধ্যে রেখা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে। আমার নিকট অনেকবার শুনিয়া থাকিবেন যে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবির্ভূত হন নাই; কারণ যত দিন একাধারে এই দুই জ্ঞানের সমাবেশ না হইবে, ততদিন উভয়ই অসম্পূর্ণ থাকিবে। তবে কবির জ্ঞান যতই সীমাহীন হইবে, যতই বিস্তারিত হইবে, কবিত্ব ততই অনন্তকালের হইবে। এ সম্বন্ধে পরে কথা হইবে।

আমি এই দুই দিন অতি সুখে কাটাইয়াছি। আপনারা যদি আমার আসাতে কিঞ্চিৎ মাত্র উৎকণ্ঠিত না হইয়া আপনাদেরই বাড়ীর একজন বলিয়া মনে করেন (এবং এইবার যেন তাহা বোধ করিয়াছি) তাহা হইলে যখন তখন আসিব। বন্ধুজায়ার অমায়িক ব্যবহারে অতিশয় সুখী হইয়াছি, এবং আপনাদের স্নিগ্ধ পারিবারিক জীবন, সহরের গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া পুত্রকন্যা-পরিবেষ্টিত হইয়া, নীরবে অথচ কর্ম্মঠভাবে যেরূপ কাটাইতেছেন, তাহা আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। আর সেই সুন্দর নদী, বালুচর, পল্লীগ্রাম ইত্যাদিতে আমার একরূপ নেশা জন্মিয়াছে। জানি না, স্বভাবের আকর্ষণে জীবন ছাড়িয়া দেওয়া উচিত কিনা।

দেখিবেন, সদরের অনুগ্রহে যেন আমি অন্দরের বিরাগভাজন না হই।

লেখার জন্য আমার উপর বিশেষ তাড়া। আমি বলিয়াছি যদি আমার গৃহিণী আগামী বারে আমার সহিত শিলাইদহে উপস্থিত হন, তাহা হইলে যতদিন থাকিব ততদিন মুকুলের*

---

* মুকুল : জগদীশচন্দ্র বসুর উৎসাহে ১৮৯৫ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছোটদের জন্য মুকুল নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। মুকুলের সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। সহকারী সম্পাদক দু'জন জগদীশচন্দ্র বসুর ভগ্নী লাবণ্য প্রভাবসু এবং যোগীনাথ সরকার।

জন্য আপনার এক একটি লেখা পাঠাইব। Journalistic instinct অতিশয় প্রবল দেখিতেছি; বিশেষতঃ শ্রীযুক্তা সরলা দেবী* নির্ব্বাপিত অগ্নিতে ইন্ধন দিয়া গিয়াছেন।

আমার কার্য্যে আরও কতকগুলি নূতন সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু the spirit is willing but the flesh is weak ; পরিশ্রমে একেবারে শ্রান্ত হইয়াছি। University হইতে আমার নাম নাকি পারিস্ যাইবার জন্য উঠিয়াছিল ; কিন্তু প্রভুদের তাদৃশ্য ইচ্ছা নাই। Lt. Governor-এর এখনও ইচ্ছা দেখিতেছি। তবে অনেক প্রতিবন্ধক হইবে। বলিতে পারিনা কি হয়।

আপনার
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

---

* সরলা দেবী : রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী। তিনি বাংলার Joan of Arc নামে খ্যাত ছিলেন।

কলিকাতা
১লা বৈশাখ

সুহৃদ্বরেষু

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। এখানে চারিদিকের গোলমালে মন সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে, আপনার চিঠি পাইয়া আপনার উন্মুক্ত দেশের কথা মনে হইল। বিস্তৃত আকাশ, নদী ও সাদা বালুব চর, এসব মিলিত সুখের ছবি আমার চক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে। কখনও মনে হয়, আপনাদের ওখানে কোন নদীশাখার তীরে একখান ঘর বাঁধিয়া মাঝে মাঝে যাইয়া বাস করি।

সেদিন আশানুরূপই ফল পাইয়াছিলাম। আমার আসিবার কয়েক ঘন্টা পরে আমার চিঠিখানা এখানে পৌছে। আমার গৃহিণী পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, ভৃত্যরাও নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল (তখন সাড়ে সাত টা), আপনাদের আবহাওয়ার গুণে আমার বিলক্ষণ ক্ষুৎপিপাসা হইয়াছিল ; যাহা হোক উপবাস করিতে হয় নাই। পরে আমাকে, টেলিগ্রাফ কেন করি নাই, এজন্য জবাবদিহি দিতে হইয়াছিল। আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছি যে, শিলাইদহে টেলিগ্রাফ আফিস নাই। কোনরূপ সত্যের অপলাপ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিব না, কিন্তু এসম্বন্ধে যদি কিছু অনুসন্ধান হয়, তবে দেখিবেন যাহাতে আমার মান বজায় থাকে!

প্রজাপতিগুলি এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। গত শনিবার হইতে প্রত্যহ গুটিগুলিকে নাড়িয়া দেখিতেছি, ভিতরে যেন পূর্ণতর হইয়া আসিতেছে। আশঙ্কা হয় এত ঘন ঘন কম্পনে কীটের প্রাণবায়ু হয়ত বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও একরূপ নিশ্চিত হইতাম, কারণ যে এরণ্ড বৃক্ষের কথা বলিয়াছিলাম তাহার পাতাগুলি একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই দুর্ভিক্ষের সময় সহসা প্রজাবৃদ্ধি মনে করিয়া ভীত আছি। বিশেষতঃ লরেন্স সাহেবের নিকট আমি কি করিয়া মুখ দেখাইব জানি না।

আপনার
শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

পুঃ আপনার সেই দুইটি গল্প কি শেষ হইয়াছে? প্রথমটি বৃহদাকারে প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

139 Dhurrumtalla Street.
১৮ই এপ্রিল ১৯০০

সুহৃৎ

আসিবার দিন সুন্দর জ্যোৎস্না ছিল। আপানাদের দেশ ও এদেশে অনেক প্রভেদ।

আপনার লেখা গল্প মাঝে-মাঝে পাঠাইবেন। প্রথম কয়টা দিন আপনি ফাঁকি দিয়াছেন। অন্ততঃ সে কয়টা গল্প আমার পাওনা আছে।

সুরেনকে বলিবেন যে ভেক বলির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। এ কয়মাস ধরিয়া যাহা করিয়াছিলাম, এবারকার Natureএ দেখিলাম যে Royal Society তে Dr. Waller "On the Electric Current in the Frog's Eye Produced by Light" সম্বন্ধে প্রবন্ধ শীঘ্রই পাঠ করিবেন। ইহাকেই বলে চক্ষুস্থির !

আমার ক্ষুদ্র বন্ধুর খবর দিবেন।

এবার আমেরিকা হইতে— বাবুর একখানা চিঠি দেখিলাম। তাঁহার সহিত নিবেদিতার তুমুল সংগ্রাম হইয়াছে।— বাবু এবং নিবেদিতা Mrs. Bull এর বাড়িতে অতিথি ছিলেন। সেখানে— বাবু বিবিধ প্রকার Pleasant কথাই বলিতেছিলেন, কিন্তু দৈবের নির্ব্বন্ধ ! সেখানে একটি meeting হয়, তাহাতে নিবেদিতা জাতিভেদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছিলেন,— বাবু চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। হঠাৎ নিবেদিতার মনে হইল যে, ব্রাহ্মরা জাতিভেদ মানে না এবং বিবেকানন্দ-স্বামীর প্রতি তাহাদের ভক্তি অপরিমিত নহে। অমনি বলিলেন, "আমি জানি যে এই meeting এ একজন আছে যিনি জাতিভেদ মানেন না এবং সনাতন ধর্ম্মের উপর যাঁহার আস্থা নাই।" তাহার পর— বাবুকে রণং দেহি বলিয়া challenge করিলেন। এইরূপ আকস্মিকরূপে আক্রান্ত হইয়া— বাবু বলিলেন যে, জাতিভেদের অনেক সদগুণ আছে। তবে কিছু কিছু অসুবিধাও আছে It Keeps down men of genius ; for example, Swamiji could not have had so much influence যদি জাতিভেদ থাকিত, ব্রাহ্মণের আধিপত্যে নিম্নজাতির উত্থান দুরূহ হইত। আর কোথা যায় ! মনে করিতে পারেন (বিবেকানন্দ) স্বামীর সম্বন্ধে এরূপ কথা ! অমনি এক scene।

পরিশেষে ঘোরতর ঘৃণার সহিত নিবেদিতা বলিলেন যে, ব্রাহ্মরা হিন্দুও নহে, খৃষ্টানও নহে, আর— বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি মৎস্যও নহ, মাংসও নহ ! ! !"

আপনাকে সমস্যা দিতেছি ; — বাবু তবে কি ? যে যাহা হউক, এরূপ অসাধারণ ভক্তি অতি দুর্লভ।*

আপনার
শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

---

* **Nature** : লন্ডন থেকে প্রকাশিত খ্যাতনামা বিজ্ঞান পত্রিকা।
* **আমার ক্ষুদ্র বন্ধু :** রবীন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে মীরাদেবী। এখানে উল্লেখ্য যে জগদীশচন্দ্র ও লেডি অবলাবসুর প্রথম জীবনে একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে মারা যায়। এরপর তাঁদের আর কোন সন্তান হয়নি। বন্ধুর মেয়ে মীরাকে জগদীশচন্দ্র নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করতেন।
* **বাবু :** বিপিনচন্দ্র পাল। প্রখ্যাত লেখক ও দেশবরেণ্য রাজনীতিক।
* **নিবেদিতা :** ভগ্নী নিবেদিতা। জন্ম ২৮ অক্টোবর ১৮৬৭ এবং মৃত্যু ১৩ অক্টোবর ১৯১১। নিবেদিতার প্রকৃত নাম মার্গারেট নোবেল। স্বামী বিবেকানন্দের দেশ দেখতে এসে আয়ারল্যাণ্ডের এই মানবদরদী মহিলা ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন এবং আমৃত্যু তিনি ভারতবর্ষে বসবাস করে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন।

কলিকাতা
৮ই জুন ১৯০০

সুহৃৎ

আপনার পৌঁছতত্ত্ব পাই না। ভাল আছেন ত? আমার বিদেশযাত্রার আর কিছু সংবাদ এখনও পাই নাই।

সেই Theoryর নতুন নতুন অর্থ দেখিতেছি। সংকেতে ২/১ টি লিখিতেছি, ‘পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু'চার দিবসে’; আপনার বুঝিতে ১৭ মিনিটও লাগিবে না।

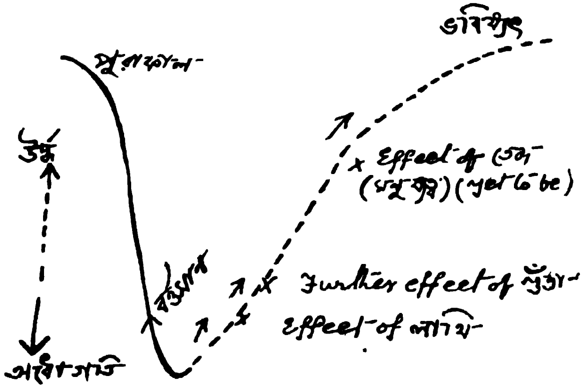

Carve of Our National Condition.
[“পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থা”।]

এই Theory অতিশয় পুরাতন। বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন। কিন্তু he was in advance of the time। সুতরাং রূপকে এই মহাসত্য প্রচার করিয়াছিলেন।

আপনার
শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

London
C/o. Messrs. Henry S. King & Co.
65 Cornhill, London, E. C.
31st Aug., 1900

সুহৃৎ

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। সর্ব্বদা যেন পত্র পাই। আমি নানাবিধ Stress and strain এর মধ্যে ; সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও দীর্ঘ পত্র লিখিতে সময় পাই না। আজ না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্যারিসে যা যা দেখিলাম, তাহাতে যেমন নূতন বিজ্ঞানের প্রভাব দেখিয়া সুখী হইয়াছি, তেমনই দেশের কথা মনে করিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইয়াছি, এই ভয়ানক জীবনসংগ্রাম নির্ম্মম বিরামহীন— এই সংগ্রামে যাহারা একটু পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, তাহারা একদিন নির্ম্মূল হইবে। এখানে কি ব্যগ্রতা ! একটি নূতন আবিষ্কার হইল, আর অমনি তাহা কাজে লাগিল। যাহারা সর্ব্ব প্রথমে তাহার ব্যবহার শিখিল, তাহারা অন্য জাতিকে ব্যবসায়ে এবং manufacture এ পরাস্ত করিল। পৃথিবী ব্যাপিয়া এই সংগ্রাম অহোরাত্র চলিতেছে। নির্ম্মম প্রকৃতি ! আমাদের ন্যায় উদ্যমহীন, অকর্ম্মঠ জাতি আর কতকাল বাঁচিয়া থাকিবে ? এসব মনে করিয়া মনের জ্বালা সম্বরণ করা অসম্ভব কি করিয়া মন দমন করা যায় বলুন। সম্মুখে আশার আলো দেখিলে মনে উৎসাহ আসে, কিন্তু ব্যর্থ উদ্যম লইয়া কে জীবন বহিতে পারে ?

এসব কথা এখন থাকুক। আমার কাজের ফল জানিবার জন্য উৎসুক আছেন ; সে-সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

প্রথমতঃ, আমি দেরীতে পৌঁছিয়াছি এবং আমি যে বিষয় বলিব মনে করিয়াছিলাম তাহা Royal Society তে শেষ মুহূর্ত্তে পৌঁছিয়াছিল, সুতরাং তাহা Publish এখনও হয় নাই। এজন্য সে-বিষয়ে বলিতে পারি কি না জানিতাম না। সে যাহা হউক, একদিন Congressএর President হঠাৎ আমাকে বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। তাতে অনেকে অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। তারপর Congressএর Secretary (তিনি ইংরাজী জানেন) আমার নিকট আমার বিষয়টির পূর্ণ account চাহিলেন, তিনি ফরাসী ভাষায় তর্জমা করিবেন। এই উপলক্ষে তিনি আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন, এবং আমার কাজ লইয়া discussion করেন। একঘণ্টা পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—But, monsieur, this is very beautiful (but এর অর্থ আমি প্রথম বিশ্বাস করি নাই। তারপর

আরও তিনদিন এ-সম্বন্ধে আলোচনা হয়, প্রত্যহই more and more excited— শেষদিন আর নিজকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। Congress-এর অন্যান্য Secretaryএবং President-এর নিকট অনর্গল ফরাসী ভাষায় আমার কার্য্য-সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, তাহার মধ্যে tres jolie magnifique ইত্যাদির বহু সমাবেশ ছিল। পরিশেষে আমাকে বলিলেন যে, আপনার বিষয়টি প্রত্যেক অক্ষরে নূতন ; এই theory প্রচার করিতে অন্ততঃ দু'বৎসর লাগিবে। সব একেবারে প্রচার করিবেন না — এত Surprise একে-বারে লোকে মনে ধারণা করিতে পারিবে না—

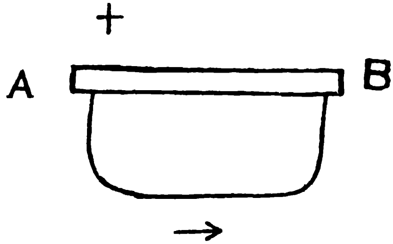

it is human nature. A বিন্দু পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, তারপর হঠাৎ মন ভাঙ্গিয়া B বিন্দুতে নামিয়া যায়। তারপর আরও বলিলেন, যে physicist- রা physiology জানেন না ; vice versa। তারপর আপনি যদি psychology-র সমাবেশ করেন, তাহা হইলে একেবারেই বুঝিতে পারিবে না। আর psychology, memory ইত্যাদি beyond physical science। এসব আনিলে লোকে আপনাকে dreamy মনে করিবে। এজন্য প্রথমে Purely physical বিষয় প্রকাশ করা উচিত।

এখানে German, Russian, American ইত্যাদি অনেক বৈজ্ঞানিকের সহিত দেখা হয়। তাঁহারা সকলেই আমার পূর্ব্বে কার্য্য অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছেন।

Helmholtz-এর পদে Berlin-এ এখন যিনি অধ্যাপক আছে (Prof. Warburg), তিনি আমাকে বলিলেন, তাঁহার Laboratory-তে আর একজন বৈজ্ঞানিক নূতন গবেষণা করিতে আসিয়াছিলেন।

"The subject of Oherer is very obscure and very interesting. I wish to work on it." তাহাতে Warburg তাঁহাকে বলিলেন, "It is undoubtedly very interesting ; but it is no longer obscure--there is a man called Bose who has left nothing more to be done."

আর একদিন Eiffel Tower-এর উপরে উঠিতেছিলাম। আমি delegate বলিয়া বিনামূল্যে যাইবার অধিকারী। আমার সহধর্ম্মিণী delegate নহেন, সুতরাং তাঁহার জন্য ৫ ফ্রাঙ্ক দিতে হইল। ফরাসী ভাষায় আমার অধিকার ত জানেন। আমার অবস্থা দেখিয়া একজন ইংরাজী ভাষায় দক্ষ ফরাসী আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, Can I be of any service ? এবং নিজের কার্ড দিলেন। আমার কার্ড দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, Bose ? Surely not

Jagadish Bose? এদেশে আমি জগদীশ বসু বলিয়া পরিচিত, কারণ আরও জার্ম্মান্ বসু আছে। পরে যখন জানিলেন আমিই তিনি, তখন যে-ব্যক্তি আমার নিকট হইতে বসুজায়ার জন্য টিকিটের মূল্য লইয়াছিল, তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন— আমাদের অতিথি বিখ্যাত বিদেশী, তাঁহার নিকট টিকিটের মূল্য প্রার্থনা একান্ত দোকানদারী, ইত্যাদি। দেখিতে দেখিতে আরও লোকসমাগম। তাহাদের টিকিট-বিক্রেতাকে যৎপরোনাস্তি অপমান, ইত্যাদি।

Dr. Wallerএর ভেকের চক্ষুতে বিদ্যুতের স্রোত সম্বন্ধে Paper এবং আমার উক্ত বিষয়-সম্বন্ধে কার্য্য এক সময়েই হয়। আশ্চর্য্য, তিনিও জীবনের 'অনুভূতির' রেখা পরিসর করিতে প্রয়াসী। তিনি প্রমাণ করিতেছেন যে, বৃক্ষেও অনুভূতি আছে, বীজেও রোপণ করিবার কয় দিন পর হইতে অনুভূতি-শক্তি বিকাশ পায়। এই স্থানেই জীবন ও মরণের প্রভেদ-রেখা। এস্থলে বলা আবশ্যক, অন্যান্য physiologistরা এই সামান্য বিষয়টি গলাধঃকরণ করিতে পারিতেছেন না। Wallerকে বাতুলশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করেন। এইসব কারণে উক্ত Waller-এর স্বভাব অতিশয় কোপন হইয়াছে। কাহারও সঙ্গে তর্ক হইলেই হাতাহাতির কাছাকাছি। উক্ত Waller-ভক্ত একজন সহকর্ম্মীর সহিত আমার একজন ভক্তের অল্পদিন হইল ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছে। Waller-ভক্ত একস্থানে বলিতেছিলেন, "দেখ 'অনুভূতির রেখা' কতদূর প্রসারিত—জীবন ও মরণের রেখা ৪র্থ দিন মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজে আবদ্ধ।" তখন বসুভক্ত বলিলেন, তাহা নহে—বীজের রেখায়, এমন কি মৃত্তিকায় পর্য্যন্ত, উক্ত রেখা প্রসারিত। তাহার পর যাহা হইল, তাহা মনে করিতে পারেন। বন্ধুরা বলিলেন, যে অন্ততঃ কয়েকমাস পর্য্যন্ত Waller কিংবা তাহার ভক্তের সংস্পর্শে আসা আমার পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইবে। দৈবের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে, উভয়ের সঙ্গে দেখা হইয়াছে। আমার নিবেদন জানাইলাম তাঁহাকে। তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়াছেন।

এই গেল পারিসের পালা। তাহার পর লন্ডনে আসিয়াছি। এখানে একজন physiologist আমার কার্য্যের জনরব শুনিয়াই বলিলেন, যে, কখনও হইতে পারে না, there is nothing common between the living and non-living। আর একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ৪ ঘণ্টা কথা হইয়াছিল। প্রথম ঘণ্টায় ভয়ানক বাদানুবাদ, তারপর কথা না বলিয়া কেবল শুনিতেছিলেন, এবং ক্রমাগত বলিতেছিলেন, this is magic ! this is magic ! তারপর বলিলেন, এখন তাঁহার নিকট সমস্তই নূতন, সমস্তই আলোক। আরও বলিলেন, এইসব সময়ে accepted হইবে ; এখন অনেক বাধা আছে। আমার theoryপূর্ব্ব সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং কোন-কোন physicists, কোন-কোন chemists এবং অধিকাংশ physiologists আমার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। কোন কোন মহামান্য বৈজ্ঞানিকের theory আমার মত গ্রাহ্য হইলে মিথ্যা হইবে। সুতরাং তাঁহারা বিশেষ প্রতিবাদ করিবেন। এবার সপ্তরথীর হস্তে অভিমন্যু বধ হইবে ; আপনারা আমোদ দেখিবেন ; "বাহবা জান্টিপি, বাহবা সক্রেটিস" ; কিন্তু আপনাদের গরীব প্রতিনিধির প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কিন্তু আপনাদের প্রতিনিধি রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে না। সে মনশ্চক্ষুতে দেখিবে, যে, তাহার উপর অনেক স্নেহদৃষ্টি আপাততঃ রহিয়াছে।

আমি সময়াভাবে সকলকে লিখিতে পারিলাম না, আমার বন্ধুজনকে সংবাদ দিবেন। আমি আসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মহারাজ ত্রিপুরাধিপের নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম— পত্র লিখিলে তাঁহাকে আমার সংবাদ দিবেন। বন্ধুজায়াকে আমার বিশেষ সম্ভাষণ জানাইবেন।

আপনার

শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

British Association
Reception Room
Bradford.
10.9.(19)00

সুহৃৎ

গত পত্রে আপনাদের প্রতিনিধিকে মুমূর্ষ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। শুনিয়া সুখী হইবেন, সমস্ত সঙ্কট অতিক্রম করিয়া আপনাদের আশা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

ভয়ের বিশেষ কারণ ছিল। আমার পূর্ব্ব Research সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক পত্রে অতিপ্রশংসাবাদ ছিল (Save me from my friends)! এবং সেই সঙ্গে prof. Lodge এর theory সম্বন্ধে অপ্রশংসা ছিল বুঝিতেই পারেন। ইহাতে Prof. Lodge অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন এবং আমার theory-র প্রতিবাদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আসিয়াছিলেন— তাঁহার বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন, অন্যদিকে আমার পরিচিত কেহ ছিল না। আমার theory বুঝাইতে হইলে অন্যুন তিন ঘণ্টা আবশ্যক। অতিকষ্টে এক ঘণ্টায় যতটুকু হয় তাহা ভাবিয়া গিয়াছিলাম। সেদিন ৮টি প্রবন্ধ ছিল, গড়ে ১৫ মিনিট করিয়া বলিতে দেওয়া হইবে, হঠাৎ এই সংবাদ শুনিলাম। ১৫ মিনিটে কি বলিব?

আমার প্রবন্ধের মুখবন্ধেই দুই theory লইয়া বাদানুবাদ, আর আমার সম্মুখেই Lodge! কি করিব?

From the results of previous experiments Prof. Lodge was *led* to suppose, etc.---But these new investigation *seem* to point to the theory of molecular strain.Strain theory-র ফল এই; দেখুন ইহাতে সব মিলিয়া যায় কি না। মিনিটের অধিক সময় নাই, কেবল কয়জন ex. উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলাম। সকলেই Lodge-এর মুখের দিকে তাকাইতেছিল, আমিও এক-এক বার দেখিতেছিলাম। জন বুলের মনের ভাব মুখে প্রকাশ পায় না। তবে যখন শেষ হইল, বহু প্রশংসাধ্বনি শুনিলাম। President বলিলেন, কলিকাতার চন্দ্র বসু আমাদের সকলেরই সুপরিচিত, ইত্যাদি। তার পর বলিলেন, যদি কাহারও কিছু প্রতিবাদ করিবার থাকে, তবে এই সময়।

না, প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। তারপর Lodge উঠিয়াও প্রশংসা করিলেন এবং বসুজায়ার নিকট যাইয়া বলিলেন,

"Let me heartily congratulate you on your husband's splendid work."

আমি মনে করিলাম, এই শেষ। আমার পূর্ব্ব স্থানে বসিয়া আছি, Lodge আসিয়া আমাকে দু-এক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বুঝিতে পারিলাম, আস্তে আস্তে মন ভিজিতেছে। John Bullএর Love of Fair Play অতি আশ্চর্য্য। তারপর হঠাৎ দেখিলাম, যে, Lodge Presidentকে কি বলিতেছেন। তখন President বলিলেন, যে, অধ্যাপক বসুর অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টিসম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের বিষয়ে অনেকে শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, পুনর্ব্বার তিনি যদি কিছু বলেন, তবে সুখী হইব। তারপর যখন বলি, তাহাতে সকলেই অতি বিস্মিত হইয়াছেন। বক্তৃতার পর Lodge বন্ধুদিগকে লইয়া আমার Stereoscope-এ M E R O ইত্যাদি দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছেন। আমাকে বলিলেন, "Yon have a very fine research in hand, go on with it"। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "Are you a man with plent of means ? All these are very expensive and you have many years before you, your work will give rise to many others--- all very important"। আমি কথা কাটাইয়া দিলাম।

তার পরের দিন Prof. Barret আমাকে বলিলেন, "We had a talk last night (Lodge was one of us). We thought your time is being wasted in India, and you are hampered there, Can't you come over to England ? Suitable chairs fall seldom vacant here, and there, are many candidates. But there is just now a very good appointment (কোন সুপ্রসিদ্ধ Universityর নূতন Professorship) and should you care to accept it, no one else will get it."

এখন বলুন কি করি? এক দিকে আমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছি—যাহার কেবল outskirts লইয়া এখন ব্যাপৃত আছি এবং যাহার পরিণাম অদ্ভুত মনে করি, সেই কাজ amateurish রকমে চলিবে না। তাহার জন্য অসীম পরিশ্রম ও বহু অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্যদিকে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে না। আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত inspiration-এর মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্নেহ। সেই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল?

এবার এইখানে শেষ করি। সর্ব্বদা পত্র লিখিবেন। বন্ধুদিগকে আমার কথা জানাইবেন।

মীরা* আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে, আমি ভুলি নাই, বন্ধুজায়াকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইবেন।

আপনার
শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

---

* মীরা : রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরা দেবী।

লন্ডন ৫ই অক্টোবর, ১৯০০
C/0. Messrs. Henry S. King & Co.
65, Cornhill, E, C.

সুহৃৎ,

অনেককাল আপনার পত্র পাই নাই। চিঠি না পাইলে কি লিখিতে নাই?

আমি কি রকম ব্যস্ত আছি, বুঝিতে পারেন। আমার অনেক নূতন বিষয় সংগ্রহ হইয়াছে। কি করিয়া লিখিয়া উঠিব, স্থির করিতে পারি না। আমি যা বলিয়াছি, তাহাতেই সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছেন। কিন্তু আরও যাহা বলিবার আছে, তাহা আরও বিস্ময়জনক। একটা সু-খবর এই যে, আমি প্রথম প্রথম ভয় করিয়াছিলাম যে, কেহ বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার কার্য্যের উপর লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে, কিন্তু তা বলিয়া অতি সাবধানে একটু-একটু করিয়া অনেক নূতন Experiment দিয়া আমার পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। আমি যখন Paris-এ প্রথম বলি, তখন কাহারও মনে একটু-একটু সন্দেহ হইয়াছিল। তারপর Secretary যখন ৪ দিন সমস্ত শুনিলেন, তখন বলিলেন যে, সব সত্য, কিন্তু লোকের বুঝিতে সময় লাগিবে ; একেবারে বলিতে গেলে অবিশ্বাস হইবে ; আপনি জানেন এদেশে Crankএর সংখ্যা অতি বেশী ; একটা বিষয় দিনরাত্রি ভাবিয়া ভাবিয়া লোকের মাথা গরম হইয়া যায়, শেষে একই ধ্যান, একই জ্ঞান। এরূপ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, সুতরাং লোকের যে সন্দেহ হইতে পারে, তাহার জন্য সাবধান হইতে হইবে। আর এখানকার বৈজ্ঞানিকেরা নানা বিভাগে বিভক্ত। Chemist and Physicistএর মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম, Physiologistsরাও সেইরূপ। সেদিন আমাদের Physical Section-এ Chemist-দিগকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। আমাদের President তাহাদিগের মন আকর্ষণ করিবার জন্য তাহাদিগের বিশেষ স্তুতিগান করিলেন। তাহার উত্তরে Chemist প্রবর উঠিয়া বলিলেন, "আমাদের ঝগড়া করিবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু আপনারদের J.J Thompson*

* J.J.Thompson : আধুনিক পরমাণু বৈদ্যুতিক মতবাদ ও পবমাণু বিজ্ঞানের জনক। তিনি মাত্র ২৮ বছর বয়সে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, ১৯০৬ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।

সেদিন বলিয়াছেন যে, Atom অভিভাজ্য নহে, তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র অণু আছে। যাহারা আমাদের atom–এর উপর হাত তোলে, তাহাদিগের সহিত আমাদের চির সংগ্রাম, There will be trouble if you lay your hands on our indivisible and inviolate atom."

তারপর একজন Physiologist–এর সহিত দেখা হয়। তিনি আমার কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, "আশা করি আপনি অন্যান্য Physicist–এর ন্যায় আমাদের সুবৃহৎ Physiology-কে Physicsএর শাখা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন না। একটা formula দিয়া সব explain করা, একি চালাকি? দেখুন আমি আজ দশ বৎসর যাবৎ নানা Curveসংগ্রহ করিতেছি। কখন উর্দ্ধে উঠিতেছে, কখন নিম্নে গমন করিতেছে, কি আশ্চর্য্য! কেন উঠে কেন নামে, কেহ জানে না এবং কেহ জানিবেও না। আসল কথা, উর্দ্ধে উঠে এবং নিম্নে নামে!"

সুতরাং বুঝিতে পারিতেছেন, আমাকে কিরূপ সন্তর্পণে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে।

আমার দু–একজন Physicist বন্ধু বলেন, যে, Psychology Science নহে সুতরাং ও বিষয়টা বাদ দিবেন। অর্থাৎ মনে হয়ত সন্দেহ হইয়াছে যে, এ লোকটা Oriental, যদি ওদিকে একবার ঝোঁক যায়, তাহা হইলে Physics ছাড়িয়া ওদিকে চলিয়া যাইবে। Podgeলিখিয়াছেন, Many congratulations on your very important and suggestive experiments, But go slowly, establish point by point and restrain inspiration.' Lord Rayleigh লিখিয়াছেন, "বড় তাড়াতাড়ি হইতেছে, ধীরে ধীরে!" Lodge এবং Rayleighএর নিকট এখনও সব কথা খুলিয়া বলিতে সময় হয় নাই। একজনকে বলিয়াছি, তিনি বলিলেন, "How can you sleep over all this ? Are you so certain of life? Write night and day and publish them at once!"

জীবনের কথা কেহ বলিতে পারে না; নতুবা ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষ হইতে এক নূতন School of Workers হইতে এক সম্পূর্ণ নূতন বিষয় প্রকাশিত হইবে। আপনারা কেন এই কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন না? তাহা হইলে এক বিষয়ের কলঙ্ক চিরকালের জন্য মুছিয়া যাইত। জীবন অনিত্য বলিয়াই আমাকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিতে হইতেছে। আমি দেশ হইতে আসিবার সময়ও জানিতাম না, যে, কি বিশাল ও অনন্ত বিষয় আমার হাতে পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ না ভাবিয়া যে থিওরি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার অর্দ্ধপরিস্ফুটিত প্রতি কথায় কি আশ্চর্য্য ব্যাপার নিহিত আছে, প্রথমে বুঝি নাই। এখন সব কথার অর্থ করিতে যাইয়া দেখি, যে, ঘোর অন্ধকারে অকস্মাৎ জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছে। যে দিকে দেখি, সে দিকেই অনন্ত আলোক–রেখা। জন্ম–জন্মান্তরেও আমি ইহার শেষ করিতে পারিব না। আমি কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা ধরিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। আবার এদিকে আমার এখানকার সময়ও ফুরাইয়া আসিতেছে। মনে করিয়াছিলাম যে, Royal Institution–এ কত দিন experiment করিব এবং সেজন্য কতকগুলি নূতন কল প্রস্তুত করিতেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাহাতে বাধা পড়িয়াছে। এখানে আসিয়া Dr. Crombieর সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, যে, আভ্যন্তরিক কি গোলমাল হইয়াছে, শীঘ্র চিকিৎসা না করিলে আশঙ্কার কারণ। কঠিন operation আবশ্যক, তাহাতে বিশেষ ভয় নাই, তবে প্রায় ৫ সপ্তাহ শয্যাগত থাকিতে হইবে। সুতরাং

আমার কার্য্যে বড় বাধা পড়িল। এখন experiment করার আশা ছাড়িয়া দিতে হইল। যদি আমার যে-সব কার্য্য হইয়া গিয়াছে। তাহা লিখিয়া যাইতে পারিতাম, তবে কিছুই ভাবিতাম না। আমি লিখিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বেশী লিখিতে পারি না। আর ৪ টি নূতন বিষয়ে লেখা আবশ্যক, তাহার জন্য দেরী হইতেছে। দেরী করাও ভাল নয়।

উপরোক্ত বিষয়টি কেবল দু-এক বন্ধুকে জানাইবেন। বৃথা চিন্তা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক নাই।

সর্ব্বদা পত্র লিখিবেন।

আপনাব
জগদীশ

লন্ডন

সুহৃৎ ১২/১০/১৯০০

আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় সুখী হইলাম।

আমার Theory আস্তে আস্তে প্রচলিত হইতেছে। অনেকে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। প্রথম প্রথম সকলে অবাক হইয়াছিলেন, এখন বুঝিতে পারিতেছেন। একখানা বৈজ্ঞানিক পত্রে লেখা হইয়াছে, যে,

...............by far the most striking contribution to Prof. J. C.Bose. This remarkable paper goes to the heart of physical things in a way that makes the reader gasp *and hold on to something lest he should fall into the infinte* When it is stated that Dr. Bose actually treats of his successful experiments with an artificial retina, which respons to invisible as well as visible lights, it is unnecessary to say more for the astounding character of his researches One of our electrical contemporaries goes so far as to remark of Dr. Bose's results, that they seem to bring us to the brink of a stupendous generlisation in the physical sciences ; and the observation is no exaggeration."

"Falling into the Infinite" is good !

তারপর কাগজে Coherence theory ভুল, আর আমার theory ঠিক, এ-বিষয় লইয়া লেখালেখি চলিতেছে। মহাশয় লজ সাহেব এরূপ ধৃষ্টতা আর যে বেশী দিন সহ্য করিবেন, তাহা মনে হয় না। আমি নির্দ্দোষী— আমি কেবল বলিয়াছিলাম, "হুজুর যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক্ ; আর আসামী-পক্ষ হইতেও কিছু বলিবার আছে।" একটা Cutting পাঠাই। কলিকাতায় যে বৈদ্যুতিক আলো-বিভ্রাট মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে, তাহা লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। আমার theoryতে তাহার মর্ম্ম বোঝা যায়। তাহাই লইয়া Correspondence.

যেরূপ গোলমেলে বিষয় লইয়া আছি, তাহার সব সূত্র মূল সূত্রে মিলিয়াছে। তবে একটি-একটি করিয়া বাহির করা কি বিপদ বুঝিতে পারেন। সমস্তক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া একটি বিষয়ের কূলকিনারা করি, সে বিষয় তখন তখন শেষ না করিলে পুনরায় গোলমাল লাগিয়া যায়। অনেক দিন সাধনা করিলে একদিন জ্যোতির্ম্ময় হয়, কিন্তু কোন distraction আসিলে আর কিছু দেখিতে পারি না। এখন কয়েকদিন কাজ করিলে অনেক বিষয় লেখা হইবে। আবার এদিকে ডাক্তার কি লিখিয়াছেন, দেখিবেন*। সেই রুগ্নশয্যা হইতে উঠিলে আমার এই সমস্ত vision ফিরিয়া আসিবে কিনা জানি না। কি করিব এখনও স্থির নাই।

আপনার

শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

* সর্ব্বদা চিঠি লিখিবেন

লন্ডন
২রা নভেম্বর ১৯০০

বন্ধু,

তোমার দুখানা পত্র পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আজ প্রায় দুমাস যাবত অহোরাত্র মনের ভিতর সংগ্রাম চলিতেছে। এখানে থাকিব, কি দেশে ফিরিয়া যাইব। তুমিও কি আমাকে প্রলুব্ধ করিবে?

ভাবিয়া দেখ। যদি সকলেই আমাদের বোঝা ফেলিয়া চলিয়া আসি, তবে কে ভার বহিবে?

আরও মনে করিয়া দেখ, তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে। তারপর একটি একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। তোমাদের উৎসাহধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম! আমার নিজের আশা ও দুরাশা অনেক কাল পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তোমাদের স্নেহের প্রতিদান করিতে আমি অসমর্থ। আমি অনেক সময়ে একেবারে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ি; কিন্তু তোমাদের জন্য আমি বিশ্রাম করিতে পারি না। তোমরা আমাকে এরূপ বাঁধিয়াছ। তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসনপরিহিতা মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় পাই। আমি ভাষায় সে-সব কথা কি করিয়া প্রকাশ করিব? তুমি বুঝিবে।

সাধারণতঃ লোকের যে-সব বন্ধন থাকে, তাহা হইতে আমি মুক্ত। কিন্তু আমি সেই অঞ্চল-ডোর ছেদন করিতে পারি না।

আমি অনেক সময়ে না ভাবিয়া লিখি। অনেক সময় বিনা চেষ্টায় মনে অনেক ভাব আসে। শেষে আশ্চর্য্য হই। সে-সব আমার অতীত; কে আমাকে এ-সব কথা শুনাইতেছেন?

আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে-সব বাধা পড়িবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিব।

গতকল্য Sir William Crookes-এর নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইয়াছি ; তিনি লিখিয়াছেন, "I have read the most interesting account of your researches with extremte interest. I wonder whether I could induce you to deliver a lecture on these or kindred subjects of research before the Royal Institution. If you could do so, I shall be very glad to put your name down for a friday Evening Discourse after Easter of 1901. I have a vivid recollection of the great Pleasure you gave us all on the occassion when you lectured a few years ago."

Royal Institution–এ Fray Evening Discourse দিতে পারিলে আমি অতিশয় গৌরবান্বিত হইতাম। বিশেষতঃ সে স্থানে experiment দেখাইতে পারিলে আমার সমস্ত theory বুঝাইতে পারিতাম। অনেকে এইরূপ নূতন theory দেখিয়া এখন সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেহ বলিলেন, "Why, if this goes on, we shall have to write entirely new text-books of Physics"। সুতরাং এখন experiment দিয়া বুঝাইলে নূতন মত প্রচারের সুবিধা হইবে। নতুবা অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না। দুঃখের বিষয় এই যে Easter–এর পূর্ব্বেই আমার ছুটী ফুরাইয়া আসিবে। ছুটী চাহিতে ইচ্ছা করে না, আর চাহিলেও পাইব কিনা সন্দেহ। এদিকে সেই Dr. Waller, the great physiologist–এর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি এখানকার প্রধান Physiological Society–তে বক্তৃতা করিতে আহুত হইয়াছি। Dr. Waller প্রথম প্রথম অতিশয় বিরোধী ছিলেন। পরিশেষে কতক কতক বুঝিতে পারিয়া অতিশয় excitedly বলেন, "It appears that your work will probably upset mine. Thruth is truth and I don't care a d---, if I am proved to be. in the wrong. So come and work ; I will place my laboratory at your disposal. Teach me of let us work together."

আমার সম্মুখে কত কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে বলিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত কিছু করিতে পারি নাই। কল প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগিতেছে। এতদিনে অনেকের সহিত আলাপ–হওয়াতে কার্য্য আরম্ভ করিবার সুবিধা হইতেছে। এখন দুই বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে অনেকটা শেষ করিতে পারিতাম। Physiological Laboratory ইত্যাদি দেশে পাইব না। আমি কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। এই সময়ে বাধা পড়িলে পুনরায় কয়েক বৎসর পর আরম্ভ করিতে অনেক সময় নষ্ট হইবে। আর এক সময়ে লোকে interest হইয়াছে, এখন করিতে পারিলেই ভাল হইত। আমি মনে করিতেছি যে, দেশে ফিরিয়া আসিয়াই দুবৎসর ছুটী লইয়া এদেশে থাকিব। তারপর প্রতি তিন বৎসর পর এক বৎসর ছুটী লইয়া এদেশে থাকিব। যদি অপরের মুখাপেক্ষা না করিয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে এইরূপে অনেকটা কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিব।

আমার যে অসুখ হইয়াছিল, তাহা এখন অনেকটা ভাল হইয়াছে। কিন্তু দেশে যাইবার পূর্ব্বে operation করা আবশ্যক হইবে। আমি আমার কতকগুলি paper শেষ করিয়া ডাক্তারের হস্তে জীবন অর্পণ করিব।

এখন তোমার বিষয়ে দু–একটি কথা লিখিব। তুমি যে cutting পাঠাইয়াছ, তাহাতে আমি একটুও সন্তুষ্ট হই নাই। তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা

অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি সার্ব্বভৌমিক। এদেশের অনেকের সহিত তোমার লেখা লইয়া কথা হইয়াছিল। একজনের সহিত কথা আছে (শীঘ্রই তিনি চলিয়া যাইবেন) যদি তোমার গল্প ইতিমধ্যে আসে তবে তাহা প্রকাশ করিব। Mrs. Kinghtকে* অন্য একটি দিব। প্রথমোক্ত বন্ধুর দ্বারা লিখাইতে পারিলে অতি সুন্দর হইবে। তারপর লোকেনকে ধরিয়া translate করাইতে পার না? আমি তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া লিখিয়াছি।

তোমার নূতন লেখা অনেক দিন যাবৎ পাঠাও নাই, পাঠাইও। আমি মনে করি, তোমার কবিতা চিরকালের জন্য। তোমার লেখা আমাকে যেরূপ জ্বলন্ত করে, সেরূপ যেন অসংখ্য লোককে করিতে পারে।

তোমার
জগদীশ

বন্ধুজায়া এবং তোমার পুত্রকন্যাকে আমার সম্ভাষণ জানাইও।

---

* **Mrs. Knight : তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন।**

২৩ এ নবেম্বর ১৯০০

সুহৃৎ,

আমার সঙ্গে বিশেষ সংবাদদাতা পাঠাইলে পারিতে ; অনেক কথা, লিখিবার সময় নাই। এখানকার আর–এক Wireless Telegraphyর লোকেরা আমার প্রথামত কল প্রস্তুত করিয়া আশাতীত ফল পাইয়া আমাকে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। তাছাড়া Royal Institution হইতে Friday Evening Discourse দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ আসিয়াছে। Sir William Crookes বিশেষ প্রশংসাবাদ করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে London–এর full Season সময়ে অর্থাৎ এপ্রিলের শেষে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিয়াছেন— তখন আমার ছুটী ফুরাইয়া যাইবে। সকলে বলিতেছেন, যে, আমার কার্য্য শেষ না করিয়া যেন না যাই। ছুটীর জন্য আবেদন করিয়াছি ; জানি না পাইব কিনা। আমার চিকিৎসার জন্য ১৫ দিন পর যাইব।

তোমার পুস্তকের জন্য আমি অনেক মতলব করিয়াছি। তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে, এখনও জানি না। publisher রা ফাঁকি দিতে চায়। সে যাহা হউক, তোমার ভাগে কেবল Glory, লাভালাভের ভাগ্য আমার। যদি কিছু লাভ হয়, তাহার অৰ্দ্ধেক তরজমাকারীর, আর অৰ্দ্ধেক কোন সদনুষ্ঠানের। ইহাতে তোমার আপত্তি আছে কি ? আমি অনেক Castles in the air প্রস্তুত করিতেছি।

এবার যদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব। ৬টি গল্প বাহির করিতে চাই। শীঘ্র তোমার অন্যান্য গল্প পাঠাইবে। Mrs. Knightকে দেই নাই। অন্যরূপে চেষ্টা করিব।

তোমার

জগদীশ

C/o Messrs Henry S.king & Co.
লন্ডন, ৩রা জানুয়ারী ১৯০১

বন্ধু,

সীজারের জাহাজ ডুবিয়া যায় নাই বলিয়া যে আমার ক্ষুদ্র ডিঙ্গি রক্ষা পাইবে, একথা বিশ্বাস হয় নাই। এখন দেখিতেছি যে, ভাগ্যলক্ষ্মী আমার উপর সীজার অপেক্ষাও সুপ্রসন্ন। কারণ যখন ব্রুটাস্ সীজারের পেটে ছুরী বসাইয়া দিয়াছিলেন, তখন উক্ত সীজার অবিলম্বে পপাত চ, মমারচে! অথচ যখন তিনজন ডাক্তার আমার উদর বিদারণ করিয়া ১৷৷০ ঘণ্টাকাল অতি সহর্ষে অস্ত্রচালনা করিয়াছিলেন, তারপর যে আমি ভবধামে ফিরিয়া অসিব, ইহা কল্পনাতীত। ক্লোরোফর্ম্মের নেশা যখন চলিয়া যায়, তারপর জীবনের উপর একান্ত ধিক্কার জন্মিয়াছিল। এবং আহার ত্যাগ করিয়াছিলাম। তখন তোমার বন্ধুজায়া আমার নিকট মাছের ঝোল ডাল ভাত রাখিতে আরম্ভ করিলেন,— এমনকি বিদেশী মৎস্য দেশীরূপে কর্ত্তিত হওয়াতে আমাকে ভ্রান্ত করিয়াছিল, — তখন স্বদেশ (আহার) প্রেম জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তর হইয়াছিল। এইরূপে প্রায় চার সপ্তাহ পর এখন একটু একটু করিয়া বল পাইতেছি। আরও চার সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতে হইবে, পরে কাজ আরম্ভ করিতে পারিব।

আমি আর এক বৎসরের ছুটী চাহিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে ছয় মাস পাইয়াছি। সুতরাং সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতে পারিব না। জার্ম্মেনী ইত্যাদি স্থানে বক্তৃতা করিবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিব না।

তুমি আমার কার্য্যের সফলতার সমস্ত খবর চাহিয়াছ। That is adding insult to injury, as the parrot said when they not only brought him from his native county, but also made him speak English ! আমাকে যদি কাজ করিয়া পরিশেষে তাহার কাহিনী বর্ণনা করিতে হয় তাহা হইলে injiury-র সহিত insult করা হইবে। তোমার স্বয়ং আসা উচিত্ ছিল, অথবা বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরণ করিলে পারিতে !

শুনিয়া সুখী হইবে, Sir William Crookes পুনঃ-পুনঃ আমাকে Royal InstiutionএFriday Evening Discourse দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে শুনিয়া লিখিয়াছেন, I am looking forward to the great treat of hearing you at the R. Institution.

তোমাকে হয়ত পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, বিখ্যাত ইলেকট্রিকাল কোম্পানী Messrs. Muirhead & Co. আমার Suggestions অবলম্বন করিয়া Wireless Telegraphy সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছেন। তিনি আঁরও বলিয়াছেন, যে, এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা না বুঝিয়া অন্ধকারে ঘুরিতেছিলেন ; অনেক বিষয়ে বৃথা চেষ্টা করিয়া হতাশ্বাস হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার থিওরি অনুসারে এখন ঠিক পথে যাইয়া অনেক উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছেন। আমি আর একটি নূতন paper লিখিয়াছি, তাহাতে practical wireless telegraphyর অনেক প্রকার সুবিধা হইবে মনে হয়। Dr. Muirhead আমাকে নূতন আবিষ্কারগুলি গোপনে রাখিতে অনুরোধ করিতেছেন ; কিন্তু আমার এখানে সময় অল্প, আমার আরও অনেক কাজ করিতে হইবে। একবার যদি অর্থকরী বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হই, তাহা হইলে আর কিছু করিতে পারিব না। তোমাকে আমি বুঝাইতে পারিব না, আমি কি এক নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি, কি আশ্চর্য্য নূতন তত্ত্ব একটু একটু করিয়া দেখিতে পাইতেছি। সে-সব আমি এখন ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না ; সেগুলি দিন দিন পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইব, তাহার কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু একভাবে দিনের পর দিন সেই সত্যলাভের জন্য ধ্যান করিতে হইবে। সেই একাগ্রতার ভাব যদি কোনরূপে disturbed হয়, তাহা হইলে আমার দৃষ্টিশক্তি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। আর আমি এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছি, তাহা অতি সামান্য, আরও অনেক আছে, কিন্তু সে-সব করা অনেক সময় ও অর্থসাপেক্ষ। যেরূপ করিয়া, যেরূপ সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিতে হয় তাহা করিতে আমি সুবিধা পাই নাই। আমার কার্য্যগুলি এরূপ অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে আমার বড় কষ্ট হয়। Dr. Waller, যিনি ভেকের চক্ষু লইয়া investigate করিতেছেন, তাঁহার নিজের Laboratory দেখিতে গিয়াছিলাম। সে-সব দেখিয়া আমি ঈর্ষাজর্জ্জরিত হইয়াছি। তিনি স্বয়ং, দুইজন assistant(ইহার মধ্যে একজন Doctor of Science) এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী, এই ৪জন প্রত্যুষ হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রত্যহ কার্য্য করিতেছেন। সেই Laboratoryর এক কোণে আহার্য্য দ্রব্য রহিয়াছে, যেন আহারের সময় কার্য্য-বিরাম না হয়। আর সেই Laboratoryর বর্ণনা তোমাকে কি করিয়া দিব ! সমস্ত সপ্তাহে ৫ ঘণ্টা তাঁহাকে Lecture দিতে হয় তাহাই তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে,এজন্য কাজ ছাড়িয়া দিবেন ভাবিতেছেন। Experiment-এর ফল photography দ্বারা স্বতঃ recorded হইতেছে। এইরূপ সম্পূর্ণতার সহিত কাজ চলিতেছে—আর আমার কাজ ভাবিয়া দেখ।

তোমার পূর্ব্বপত্রে, আমি যাহাতে স্বাধীনরূপে একটু কার্য্য করিতে পারি, এ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখিয়া, আমার মত জানিতে চাহিয়াছ। এ সম্বন্ধে আমি কি বলিব ? তুমি আমার হইয়া যাহা ভাল মনে কর আমি তাহাই করিব। তবে এ সম্বন্ধে দু-একটি বিষয় তোমাকে জানাইতেছি।

(১) তুমি কি মনে কর যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দু-একজন ব্যতীত কেহ আমার কার্য্যে সাহায্য করিতে ব্যগ্র ? দেখ, আমি দু-একজনকে সন্তুষ্ট করিতে পারি। কিন্তু তাহার অধিক করিতে সমর্থ হইব না।

(২) আর এক কথা এই যে, যদিও নিম্নকর্ম্মচারী হইতে আমি বাধা পাইয়াছি, কিন্তু Lt. Governor আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু বাইরে এই দুই রাজশক্তির বিভিন্নতা

লোকে বুঝিবে না। আমি কোনরূপে অকৃতজ্ঞতা-দোষে দোষী হইতে চাহি না। যদি আমার কার্য্যে কেহ সাহায্য করেন, তবে তাহা যেন আমার কার্য্যে সন্তুষ্টি হইতে হয়, রাজপুরুষদের উপর সন্তোষ কিম্বা অসন্তোষ হইতে না হইলেই ভাল হয়।

(৩) যদি বক্তৃতা কিম্বা পুস্তক প্রকাশ করিয়া আমি তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে সুখী হইব।

আমাকে প্রতি তৃতীয় বৎসরে এদেশে আসিয়া আমার কার্য্য সম্বন্ধে প্রচার করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত সংশ্রব সহজে একেবারে কাটিতে চাহি না, কারণ তাহা হইলে আমার কার্য্যে কোন বাঙ্গালী নিযুক্ত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য ছাত্রদিগের অনুসন্ধান-কার্য্যে তাহা হইলে সুবিধা হইবে না। তবে কতদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে থাকিতে পারিব, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

আমি Society of Artsএ Science in Ancient and Modern India সম্বন্ধে বক্তৃতা করিব। তুমি এ সম্বন্ধে Medicine, Astronomy, Chemistry যাহা যাহা সংগ্রহ করিতে পার, পাঠাইও। আগামীবারে লিখিব। বন্ধুজায়াকে আমার সম্ভাষণ জানাইও।

তোমার

জগদীশ

C/o Messrs. Henry S. King & Co.
65 Cornhill, London.
3rd May, 1901.

বন্ধু,

তোমার "নৈবেদ্য" সময়মত আসিয়াছে। আমার পরীক্ষার আর ৭ দিন বাকী আছে, তখন তোমাদের ধ্বজা এই পশ্চিম জগতে উত্থিত করিতে পারিব কি না, তাহার পরীক্ষা হইবে।

আমি একঘণ্টা সময়ের মধ্যে অতি দুরূহ বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারিব কি না জানি না। সমস্ত বিজ্ঞান আচ্ছন্ন করিয়া নূতন এক মহান সত্য যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহা দু'একদিনের প্রচার করিবার আশা করি না।

আমি যে-বিষয় British Association-এ বলিয়াছিলাম, তাহা দুরূহ বৈদ্যুতিক নূতন বিষয়, সুতরাং Physiologis -রা হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই ; আর physiology যে physics-এর অন্তগর্ত, ইহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। আমি সেই বিশ্বাস যে একদিনে দৃঢ় করিতে পারিব তাহা মনে করি না। জীবন যে একটা মহান সত্তা—জড়জগতের হইতে বহু উচ্চে স্থাপিত, একথা এদেশের বৈজ্ঞানিক ও খৃষ্টধর্ম্ম বিশ্বাসী লোকের সহজ জ্ঞান স্বরূপ।

তবে সম্পূর্ণ নূতন উপায়ে, এক অতি আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়ার ফলে আমি সেই সত্য প্রমাণ করিতে পারিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন Physiologist বলিয়াছিলেন যে, আপনি metallic particles লইয়া experiment করিয়াছেন। আমরা solid ; কোন Solid meta- এ চিম্‌টি কাটিয়া তাহার অনুভূতিচিহ্ন যদি দেখাইতে পারেন তাহা হইলে দ্বিধা থাকে না।

আমি এক নূতন কল প্রস্তুত করিয়াছি,- তাহাতে এই চিম্‌টি কাটিবার ফলে যে অনুভূতিরূপ স্পন্দন হয় তাহা Automatically recorded হয়। সেই record আর আমাদের শরীরে চিম্‌টি কাটিলে যে record হয় (যাহার record physiologist রা পাইয়াছেন), তাহার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। আর জীবনের স্পন্দন যেরূপ নাড়ী দ্বারা বোঝা যায়, সেইরূপ জড়েরও জীবনীশক্তির স্পন্দন আমার কলে লিখিত হয়।

তোমার নিকট এক অতি আশ্চর্য্য record পাঠাইতেছি। স্বাভাবিক নাড়ীর ক্রিয়া দেখিবে, তারপর বিষপ্রয়োগে নাড়ীর স্পন্দন বিলোপ হইতেছে দেখিবে। জড়ের উপর বিষপ্রয়োগ হইয়াছিল।

কি অত্যাশ্চর্য্য নূতন জগৎ আমার সম্মুখে প্রতিভাসিত হইয়াছে বলিতে পারি না। কি অসীম নূতন সত্য সম্মুখে রহিয়াছে।

একদিন মনে করিয়াছিলাম যে, এমন দিন কবে আসিবে যে দেশ-দেশান্তর হইতে জ্ঞান-আহরণের জন্য ভারততীর্থে লোকসমাগম হইবে। সেই আশা পূর্ণ হইয়াও হইল না। আমার সমস্ত পুঁজি এদেশে রাখিয়া রিক্তহস্তে ফিরিতে হইবে। কারণ, আমাদের দেশবাসীরা কেবল অতীতের গৌরবে অন্ধ হইয়া আছেন। বর্ত্তমান কালে আমাদের যত অধোগমন হউক না কেন, আমরা অতীতকালের কথা স্মরণ করিয়া উৎফুল্ল থাকিব। সেই কথা স্মরণ করিতে আমাদের কি অধিকার? এই নৈরাশ্যের মধ্যে তোমার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।

মোর কল্পনাতীত— কি তাহার কাজ— কোন্ পথ তার পথ? বন্ধু, তুমি এই বিশ্বাস চিরকাল প্রচার করিও। আমরা জানি না, আমরা কোন ফলের আশা করি না, তবু যেন আমাদের কার্য্য করিবার শক্তি নির্ম্মল না হয়। কোনদিনে কোনকালে আর কেহ দেখিবে। বিশ বৎসর পরে আমরা কেহ রহিব না, কিন্তু আমাদের আশার উচ্ছ্বাস যেন চিরজীবন্ত থাকে।

তোমার নিকট পরামর্শ চাই। অন্ততঃ আরও ৫ বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে এই কার্য্য কোনরূপে সমাধা হইতে পারে, দেশে ফিরিলে (যতদূর বুঝিতে পারিতেছি) সব কার্য্যের বিরাম। এদেশে আর কিছুকাল থাকিব কি? আরও ইচ্ছা হয় যে জার্ম্মেনী ফ্রান্স আমেরিকা ইত্যাদি দেশে এ বিষয় প্রচার করি। কি মনে কর?

ছবি পাঠাইয়াছ, বড় সুখী হইয়াছি। আমার অনেক কালের রুদ্ধ স্নেহ তোমার কন্যার মুখ দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। তুমি যে দান করিবে বলিয়াছিলে, সে-কথা ভুলিও না।

তোমার সহধর্ম্মিণীকে আমার সম্ভাষণ জানাইও।

তোমার
জগদীশ

লন্ডন। ১৭ই মে, ১৯০১

বন্ধু,

তুমি আমার সংবাদ জানিবার জন্য ব্যস্ত আছ। বক্তৃতার আগের দিন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত কি বলিব স্থির করিতে পারি নাই। এক ঘণ্টার মধ্যে Physiology, Physics, এবং Chemistryর দুরূহ শেষ মীমাংসা হইতে আরম্ভ করিয়া এই নূতন বিষয় কি করিয়া বুঝাইব? আর Experiment গুলিও অতি কঠিন। কতকগুলি কল শেষ দিন মাত্র প্রস্তুত হইল। তারপর একটি ঘটনা হইল, সে-কথা স্মরণ করিলে আমার এখনও রোমাঞ্চ হয়। আমি বৃহস্পতিবার দিন দুপ্রহরের সময় একেবারে নিরুদ্যম হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম; আমার কি এক গভীর কষ্টে বুক ফাটিতেছিল, তোমাদের এত দিনের আশা কেবল আমার শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য নির্ম্মূল হইবে একথা মনে করিয়া যে কি গভীর যাতনা পাইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এমন সময় এক আশ্চর্য্য unscientific ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ ছায়াময়ী মূর্ত্তি দেখিলাম, বিধবার বেশ-ধারিণী, কেবল এক পার্শ্বের মুখ দেখিতে পাইলাম। সেই অতি শীর্ণ, অতি দুঃখিনীর ছায়া বলিল, 'বরণ করিতে আসিয়াছি'। তারপর মুহূর্ত্তের মধ্যে সব মিলাইয়া গেল।

জানি না, কেন এরূপ হইল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার সব যন্ত্রণা দূর হইল। কি হইবে আর কিছুমাত্র ভাবি নাই। কি বলিব তাহাও আর ভাবিলাম না। তারপর দিন যখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম তখন কিয়ৎক্ষণ মাত্র অনির্ব্বচনীয়ভাবে অভিভূত হইয়াছিলাম, তারপর যেন সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া গেল, কে আমার মুখ দিয়া কথা বলাইল, জানি না; যাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই তাই মুহূর্ত্তে পরিস্ফুট হইল।

Electrician পাঠাই, কতক সংবাদ তাহাতে পাইবে। হিন্দুর সূক্ষ্মবুদ্ধি একবার Patronisingরূপে পূর্ব্বে শুনিয়াছি, আমি আমার সেই জাতীয় গুণের জন্য আজ অহঙ্কার করিব। কারণ, সেই পূর্ব্বপুরুষদের গুণে বঞ্চিত হইলে আমি এত তমসাচ্ছন্ন প্রহেলিকা ভেদ করিতে পারিতাম না। আমি অনেক সময়ে একেবারে আশ্চর্য্যে অভিভূত হইয়াছি, কে আমাকে যেন এক রহস্য হইতে অন্য রহস্যের দ্বার উদঘাটন করিয়া সত্য দেখাইতেছে! তবে হিন্দুর practical বুদ্ধি নাই, তাহার উত্তরও *Elecitrician* এ দেখিবে। আমার বক্তৃতার

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে একজন অতি বিখ্যাত টেলিগ্রাফ কোম্পানির ক্রোড়পতি Proprietor টেলিগ্রাফ করিয়া পাঠাইলেন, দেখা করিবার বিশেষ দরকার। আমি লিখিলাম, সময় নাই। তার উত্তর পাইলাম, "আমি নিজেই আসিতেছি"। অল্পক্ষণ মধ্যেই স্বয়ং উপস্থিত। হাতে Patent form। আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, আপনি যেন বক্তৃতায় সব কথা খুলিয়া বলিবেন না, "There is money in it. Let me take out a patent for you. You do not know what money you are throwing away", ইত্যাদি। অবশ্য, "I will only take half share in the profit---I will finance it",ইত্যাদি। এই ক্রোড়পতি আরো কিছু লাভ করিবার জন্য আমার নিকট ভিক্ষুকের ন্যায় আসিয়াছে। বন্ধু, তুমি যদি এ দেশের টাকার উপর মায়া দেখিতে—টাকা—টাকা কি ভয়ানক সর্ব্বগ্রাসী লোভ ! আমি যদি এই যাঁতা-কলে একবার পড়ি, তাহা হইলে উদ্ধার নাই। দেখ আমি যে কাজ লইয়া আছি, তাহা বাণিজ্যের লাভালাভের উপরে মনে করি। আমার জীবনের দিন কমিয়া আসিতেছে, আমার যাহা বলিবার তাহারও সময় পাই না, আমি অসম্মত হইলাম। কিন্তু সেদিন আমার বক্তৃতা শুনিতে অনেক টেলিগ্রাফ কোম্পানীর লোক আসিয়াছিল ; তাহারা পারিলে আমার সম্মুখ হইতেই আমার কল লইয়া প্রস্থান করিত। আমার টেবিলে Assistant এর জন্য হাতে লেখা নোট ছিল, তাহা অদৃশ্য হইল।

আমার বক্তৃতা এখনও প্রকাশ হইবে না, কারণ Royal Society আমাকে তথায় বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। They made a special case, for they never accept anything read before any other Society। সে দিন যত physiological expert রা থাকিবেন। Sir Michaelনিজে আমার Paper communicate করিবেন। আমি experiment করিয়া দেখাইব।

তবে আমার সম্মুখে বহু বাধা আছে। প্রথম—Commercial interest। অনেক patent আমার কার্য্য দ্বারাও আমার নূতন আবিষ্ক্রিয়াতে অকর্ম্মণ্য হইবে। দ্বিতীয়,—যাঁহারা Coherer theory বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বিশেষ আপত্তি করিবেন। তৃতীয়—Physiologist রা জীবন বলিয়া একটা নূতন অতি মহৎ একটা কিছু বুঝেন। তাঁহাদের বিজ্ঞান mere Physics, একথা কোন মতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। ৪র্থ—কোন কোন মূঢ় লোকে মনে করেন যে, বিজ্ঞান দ্বারা জীবনতত্ত্ব বাহির হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা অতিশয় পুলকিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া খ্রিষ্টবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকেরা কিছু তটস্থ হইয়াছেন। এজন্য আমি কোন কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব।

Dr. waller, যিনি জীবনের শেষ লক্ষণ বাহির করিয়াছিলেন, তিনি অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইয়াছেন।

সুতরাং আমাকে একাকী এত বিপক্ষের সহিত বুঝিতে হইবে। কি হইবে জানিনা।

তবে যাঁহাদের কোন Self interest নাই তাঁহারা অতিশয় উল্লসিত হইয়াছেন। তবে তাঁহারা বলেন, "you must remember that the greatest discovery of the last century---the mechanical equivalent of Heat by Joule---was rejected by the Royal Society as unscientific ; but twenty yearls after the Royal Society published the same paper in their transactions. you have brought foward a

great discovery haveing far-reaching consequences. Have you the Courage and persistency to fight for it and force it to be universally accepted ? ypu who see it so clearly alone can do it ; there is none else who can take up your work. If you leave it in its present state, it will be lost.

কি করিব বল ? আমার দেশে ফিরিবার সময় আসিয়াছে (আগামী September মাসে)। সেখানে সমস্ত কাজ ত বন্ধ হইবে। আমি সমস্ত মন দিয়া সমস্ত গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া যদি কার্য্য করিতে পারি, তবে আর দুই বৎসরে যদি কোন প্রকারে কার্য্য সমাধা করিতে পারি। আমাকে যে আর ছুটী দিবে এরূপ বিশ্বাস হয় না। দেশে ফিরিলে কিরূপ কার্য্যের সুবিধা হইবে তাহার নমুনাস্বরূপ একখানা চিঠি পাঠাই। উক্ত হতভাগ্য আমার recommendation এ Research Scholarship পাইয়াছিল, তাহার উপর বিশেষ জুলুম ! যদি কোন বিষয় একবার Race question এ দাঁড়ায়, তাহা হইলে শেষে কি হয় তাহা জান।

আমার বক্তৃতার শেষ অংশ তোমাকে পাঠাইতেছি। Sir William Crookes বলিলেন যে, Royal Institution হইতে যখন আমার বক্তৃতা প্রকাশিত হইবে, তখন যেন শেষের দুই পংক্তি quotation দিতে ভুলিয়া না যাই। "I have scarcely heard anything so grand/ "Sir Robert Austen, the greatest authority on metals, আহলাদে অধীর হইয়া আমাকে বলিলেন, "I have all my life studied the properties of metals. I am happy to think that they have life" ! তারপর বলিলেন, সেকথা আমাকে আবার শুনিতে দিন। তারপর বলিলেন, "Can you tell me whether there is a future life-- what will become of me after my body dies ?"

বন্ধু, আমাদের যাহা অমূল্য রত্ন আছে তাহা ভুলিয়া মিছামিছি না বুঝিয়া হিন্দুয়ানী লইয়া গর্ব্ব করি ! আমাদের প্রকৃত Inheritence বুঝাইয়া দাও, প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝাইয়া দাও।

আজ এখানেই শেষ করি।

তোমার
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

S.S,Hera.North Sea.
22.5.1901.

বন্ধু,

আমার সেই অসুখের পর এই পাঁচ মাসে রবিবার পর্য্যন্ত ছুটি পাই নাই। তাহার প্রতিফল পাইতেছি। আমার লেক্‌চারের পর দু'বার মাথায় রক্ত উঠিয়া গুরুতর অসুখ হইয়াছিল। সমস্ত কাজকর্ম্ম কতক দিনের জন্য না ত্যাগ করিলে ডাক্তারেরা অমঙ্গল আশঙ্কা করেন। সেই জন্য জাহাজে কতকদিন ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

অনেক অনুসন্ধানের পর Liverpool Mathematical Society র সম্পাদকের সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাঁহার নিকট তোমার দাদার লেখা দিয়াছি। তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া পড়িবেন এবং অন্যান্য Specialistদের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া আমাকে পরে পত্র লিখিবেন। তোমার দাদাকে আমার প্রণাম দিও।

রয়্যাল সোসাইটীতে আমার বক্তৃতা ৬ই জুন হইবে। তখন লন্ডনে থাকিব মনে করিতেছি। এ পর্য্যন্ত অনেকের নিকট হইতে উৎসাহজনক কথা শুনিতেছি। তবে তাঁহারা বলিতেছেন, "It is too sudden-we do not now Know whether we are starting mom heads!" Daily কাগজেও লইয়া একটু আমোদ চলিতেছে। Globeলিখিয়াছে, যে, ধাতুর উপর বিবিধ অত্যাচার করিবার সময় "The Professor's eyes were full of tears. This des him credit ; but it will be long before he induces the British Householder to pet the fire-iron when it falls on the fender because the fall hurts the fire iron."

তুমি ত আমাকে বিশেষ করিয়া জান, কবে আমি জন্ বুলের বিরুদ্ধে এরূপ libel করিয়াছি? যে জন্ বুল S.A. এবং China–তে ইত্যাদি, সেই জন্ বুল যে লোহা আছাড় খাইয়া পাড়িয়াছে বলিয়া দুঃখ করিবে, একথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তাহাদের সম্বন্ধে এরূপ দোষারোপ করিতে আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ।

সে যাহা হউক, আরও অনেক আশ্চর্য্য বিষয় discover করিবার আছে। তারপর জার্মেনীতে যাওয়া বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। সেখান হইতে শুনিয়াছি, যে, "We are more ready to accept your ideas than conservative England"। তা ছাড়া ফ্রান্স্ ও আমেরিকায় তোমাদের যজ্ঞের অশ্ব প্রেরিত হইবে কি?

বৈশাখের ভারতীতে তোমার গল্পটি অতি সুন্দর হইয়াছে। তুমি কি এক ভয়ানক পরিণাম প্রস্তুত করিতেছ জানি না।

ভাল কথা ; তোমার লেখা অনুবাদ করিয়া কোন ম্যাগাজিনে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহারা দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, গল্প অতি সুন্দর ; কিন্তু original ব্যতীত অনুবাদ আমরা বাহির করি না। তোমার নাম জাল করিতে যদি অধিকার দাও, তাহা হইলে অনুবাদের কথা না বলিয়া একবার তোমার নাম দিয়া পাঠাইতে পারি। কি বল ?

তোমার বই পুস্তকাকারে বাহির করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এদেশের অনেক পাব্লিশার চোর। বাণিজ্য-বিষয়ে এদেশের তৎপরতা দেখিয়া চক্ষুস্থির হইয়াছে। সেদিন যে আমার জন্য patent লইবার জন্য একজন বন্ধু আসিয়াছেন, তিনি সেদিন রাগ করিয়া গিয়াছিলেন। "এত সময় নষ্ট করিয়া আপনাকে Serveকরিবার জন্য আসিয়াছিলাম, আপনি কিছু করিলেন না, "I do not want to have anything more to do with it." লেক্‌চারের পর আবার লিখিয়াছেন, "I want to serve again." বন্ধু, আমি যেন এই Commercial Spirit হইতে উদ্ধার পাইতে পারি। একবার ইহার মধ্যে পড়িলে আর উদ্ধার নাই। একটা কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমার Experiment এত অদ্ভুত, যে, স্বচক্ষে না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিত না। Experiment দেখিয়া যদিও অবিশ্বাস দূর হইয়াছে, তথাপি আমার বক্তৃতার পর একজন বিখ্যাত Electrician, Mr. Swinton, তাঁহার বন্ধুবর্গকে বলিতেছিলেন, "This is something beyond science, this is *Esoteric Buddhism.*" আমি যে quotation বলিয়াছিলাম, তাহাতেও কাহার কাহার এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে। এখন বলত কি করি ?

আমি British Association এ যখন বলিয়াছিলাম, তখন লোকে বিশ্বাস কি অবিশ্বাস করিবে, স্থির করিতে পারে নাই। এখন যখন সম্পূর্ণ নূতন method দ্বারা সেই বিষয় প্রকারে প্রতিপালন করিলাম, তখন লোকে মনে করিতেছে "ভৌতিক ব্যাপার।" এ বিষয় প্রচার করিতে অনেক সময় লাগিবে ; তবে Sir M. Foster যখন Royal Societyতে Communicate করিয়াছেন, তখন সেইদিন আরও সমালোচনা হইবে। তারপর Physiolohical Society, পরে Medical Association, ইত্যাদি অনেক স্থানে বলিতে হইবে। ভূতের শ্রাদ্ধ করিতে যাইয়া আমার পঞ্চভূত যে বিভিন্ন ভূতে আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহার সন্দেহ নাই।

যদি আমার এদেশে অধিক দিন থাকা আবশ্যক মনে কর তবে তোমাকে আসিতে হইবে। লোকেন যে কবি হইয়াছে। বেশ লিখিয়াছে। উহাকে এখন শৃঙ্খলাবদ্ধ না করিলে কখন কি করিয়া ফেলে বলা যায় না।

বন্ধুজায়াকে আমাদের দুজনের সাদর অভিবাদন জানাইবে। মীরাকে সকল প্রকার গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা করাইতে বলিবে। তোমার বন্ধুজায়ার বিশেষ পছন্দ হইয়াছে।

তোমার
শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

লন্ডন
৬ই জুলাই ১৯০১

বন্ধু,

তোমার পত্র ও কবিতা পাইয়া আমি কিরূপ উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা জানাইতে পারি না। তুমি কি জান যে, এই বিদেশে থাকিয়া, দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমার মন কিরূপ অবসন্ন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সম্মুখে অজ্ঞাতরাজ্য, আমি একাকী পথ খুঁজিয়া একান্ত ক্লান্ত, কখনও একটু আলোক পাই তাহারই সন্ধানে চলিতেছি। তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই— সেই মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে? তাঁহার বরেই আমি বল পাই আমার আর কে আছে? তোমাদের স্নেহে আমার অবসন্নতা চলিয়া যায়, তোমরা আমার উৎসাহে উৎসাহিত, তোমাদের বলে আমি বলীয়ান্। তোমাদের আশাতে আমি আশান্বিত। আমি আর নিজের সুখ-দুঃখের কথা ভাবিব না ; কি করিতে হইবে বলিও। তোমরা যে আমাকে ঘিরিয়া আছ, আমি যে একাকী নই, তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি। তবে আমি যে কার্য্যভারে ও নিরাশায় অনেক সময় অবসন্ন হইয়া পড়ি, একথা মনে রাখিও, মাঝে মাঝে তোমাদের উৎসাহবাক্যে আমাকে পুনর্জ্জীবিত করিও।

আর-একটা কাজ তোমাকে করিতে হইবে। তুমি যদি আমাকে তোমার হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি আমার সুখে সুখী, আমার কষ্টে দুঃখী। আমি আমার সম্মানের কার্য্য ভিন্ন অন্য কথা ভাবিতে পারি না, ভাবিলেও কি উচিত বুঝিতে পারি না। আমার কি শ্রেয়ঃ তুমিই তাহা আমার হইয়া স্থির করিও। তুমি আমার সমস্ত বিষয় জানিয়া যাহা ভাল তাহা স্থির করিও।

তবে এখন সব কথা বলিতেছি। আমি এদেশে একজনকে জানিয়া অতিশয় সুখী ; তাঁহার অত্যাশ্চার্য জীবন-কাহিনী তোমাকে দেখা হইলে বলিব। তাঁহার ন্যায় বহু বিজ্ঞানে জ্ঞানী বোধ হয় আর কেহ নাই। তিনি গত ৫০ বৎসর ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানে যে-সব যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস এবং তাহার নেতাদের জীবন-চরিত বিশেষরূপে জানেন। তিনি আমার এই নূতন বিষয় জানিয়া বড়ই উৎসাহিত হইয়াছেন। তবে বলিলেন,

"You will very probably not live to see ot universally accepted, it is too daring for this theological country. If you could persist the younger

generations would have accepted you. You ought to go to Grermany. But can you stand by yourself for yoars? Those who succeeded had brilliant disciples, they evoted themselves to the master. Have you any ? You think scientific men are lıberal---they are the most conservative of peoples. They are contented with what they have now : --- Doubt is the Devil. your theory upsets the old established physiological dogmas. Do you think they will easily give up, unless you make them? Have ypu made up your mind to fight single-handed for years? Then and then only they will come round. But if you leave it now, thew will try not to think of it, and the thing will be forgotten, till some one elso takes it up and makes a name by it,"

আমার disciple ত নাই, তবে persistence আছে। এইজন্য মনে করিয়াছিলাম, ৫ বৎসর এখানে থাকিয়া সমস্ত objection meet করিয়া একরূপ মত স্থাপন করিতে পারিব।

আমি এ ছাড়াও অন্য তিনটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ে Paper লিখিয়াছি। শুনিয়া সুখী হইবে, Royal Society তাহা Publish করিবেন।

কিন্তু এই সম্পূর্ণ অভাবনীয়, সম্পূর্ণ নূতন বিষয় যদি আমাদের দেশ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত, তাহা হইলে আমি জীবন সার্থক মনে করিতাম।

আমি দুই বৎসরের Extentionএর জন্য India Office এ আবেদন করিয়াছিলাম। Under Secretary of State বলিলেন, পাইতে কোন কষ্ট হইবে না। তারপর জানি না হঠাৎ কি হইয়াছে— দেশে কিম্বা India Officeএ—হয়ত তোমাদের আনন্দের কোলাহল অপ্রিয় হইয়া থাকিবে— হঠাৎ খবর পাইলাম, যে, যদিও আমার Scientific work is very important, yet the Secretary of State regrets, ইত্যাদি। আমাকে সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

ইতিমধ্যে British Association ইত্যাদি স্থান হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। আস্তে আস্তে আমার মত যে গৃহীত হইল তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল, কিন্তু এই সংবাদে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গেল, বন্ধু, তুমি কি আমার মনের কষ্ট বুঝিতে পার?

আমি কি করিব জানি না। ফার্লোর জন্য আবেদন করিব, কিন্তু যদি আমার এদেশে থাকা তাহাদের অনভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে যে ছুটী পাইব মনে হয় না।

তুমি তপস্যার কথা লিখিয়াছ; বলত আমি কি করিয়া মনস্থির করিতে পারি।

তুমি আমাকে নিশ্চিত করিবার ভার লইতে চাও। দেখ, আমার কার্য্য করিবার ইচ্ছা জান, তবে কতকাল স্বাস্থ্য থাকিবে জানি না, কতকাল কার্য্য করিতে পারিব, তাহাও জানি না। তোমরা যদি কোনদিন নিরাশ হও।

যদি তুমি বল তাহা হইলে একবার দেশে থাকিয়া সমস্ত ছাড়িয়া এদেশে থাকিব।

আমাকে শীঘ্র পত্র লিখিও।

তোমার
জগদীশ

লন্ডন
১১ জুলাই ১৯০১

বন্ধু,

তুমি কি করিয়া জানিলে আমার হৃদয়ে দিবারাত্রি কি সংগ্রাম চলিতেছে? আমি নিশ্চয় জানি যে, আমার ভিতরে এখন যাহা আসিয়াছে তাহা যদি অল্প সময়ের জন্যও ছাড়িয়া দি, তাহা হইলে তাহা আর ফিরিয়া পাইব না। দীর্ঘ রোগশয্যার সময় আমি বহুযত্নে মন স্থির করিয়াছিলাম, তাহার পর এই ছয় মাস মাত্র একাগ্রভাবে সাধনা করিয়াছি। এতদিনের চেষ্টার ফলে এখন আমার মন প্রাণ আচ্ছন্ন করিয়া কি এক আলোক আসিয়াছে। দেখ, যদি সমস্ত বৎসরের চেষ্টার ফলে কেহ একটি paper Royal Society তে প্রকাশ করিতে পারে, তাহা হইলে কৃতার্থ মনে করে। আমি ছয় বৎসরের কার্য্য এই ছয় মাসে করিয়াছি—

1. On the conitnuity (?) of effect of light and Electric Radiation of Matter.
দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলোকের একই প্রভাব প্রমাণিত হইয়াছে।
2. On the similarity of effect of Mechanical and Radiation Strains.
3. On a new theory of photographic action.
4. On the Electiric Response of Inorganic Substance.
5. On the three types of electric conduction.

এই কয়টি বিষয় এই কয় মাসে শেষ করিয়াছি, এবং Royal Societyতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহার এক একটি বিষয়ে জীবনব্যাপী নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়ার কার্য্য রহিয়াছে। যদি কেবল যশঃ সঞ্চয় তোমাদের অভিপ্রেত হয় তবে এই সব নূতন বিষয় দ্বারা সহজেই করিতে পারি। কারণ এইসব বিষয় পদার্থতত্বসম্বন্ধীয়, ইহার সমস্ত মূলমন্ত্র সহজেই সাধনা করিতে পারিব এবং সকলকে বুঝাইতেও পারিব।

কিন্তু জীব ও নির্জ্জীব জগতের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে আমার সমস্ত জীবন দিতে হইবে। কারণ ইহা দুই মহাশাস্ত্রের সন্ধিস্থলে। এদেশে বিভিন্ন শাস্ত্র-ব্যবসায়ীর মধ্যে কি গুরুতর বিরোধ, তাহা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। Physicist এবং Chemist এবং উভয়ের সহিত Physiologist-দের কি অহর্নিশি দ্বন্দ্ব! সাবধান, কেহ যেন নিজ সীমা লঙ্ঘন করে না! আমরা Physiologist, আমরা জীবিত বস্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করি— We do not deal with dead matter. We do not depend on mere physical laws.

আমরা বহুবাদী, এরূপ কিম্বদন্তী আছে। প্রকৃত বহুবাদিকে এখন বুঝিতে পারিতেছি। তুমি হিং টিং ছট লিখিয়া আমাদের দেশবাসীকে গালাগালি দিয়াছ। যদি এদেশের হিং টিং ছট দেখিতে। আমরা কোথায় লাগি! সম্পূর্ণ অর্থহীন ঘোর বাগাড়ম্বর, যে বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা কম জানা সে বিষয়েই সর্ব্বপেক্ষা শব্দাড়ম্বর। চিমটি কাটিলে দেখা যায়, A + হইয়াছে এবং B– হইয়াছে— বিদ্যুততরঙ্গ

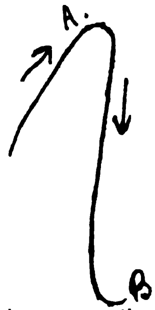

চালিত হয়। Explanation---this is because stimulus produces Anodic and Kathodic difference!

(Anode=greek for +

Kathode=greek for--)

এসব ত কিছুই নয়। কথার ঘটা এতদূর বাড়িয়াছে, যে, একজন physiologist অন্যের অর্থ বুঝিতে পারেন না।

"Wonderful is the power of word. I and Hering have been fighting all the time, by the same word he meant one thing and I another!"

সুতরাং এই সমস্ত জাল ভেদ করিতে হইবে। তারপর হয় এক theory কিম্বা অন্য theory টিকিয়া যাইবে। Both cannot be true, one must give way to the other.

সুতরাং বুঝিতে পার ইহাতে জীবনসর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে। আমি একদিকে একা কিন্তু তোমরা যদি বল তবে আমি প্রস্তুত আছি। আমি সহজ পথ ত্যাগ করিয়া কঠিন বর্ত্ম অলবম্বন করিব। হিন্দুরা কোন দিন ফলের আশায় কার্য করে নাই। ইহাতেই তাহাদের নিষ্ফলতা, ইহাতেই তাহাদের গৌরব।

তবে সম্পূর্ণ নিরাশ হইবারও বিশেষ কারণ দেখি না। তোমাকে যে–সব কথা আগে লিখিয়াছি তাহা কেবল তোমার মন বহুকাল অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য। সেদিন Sir william Crooks* আমাকে বলিলেন, "Prof. Bose, you will learn that many are engaged in this county in research work---they are engaged in work which will lead to *nothing,* but you have got *something* of which there will be no end."

বর্ত্তমান কালের ধাতু (metallurgv) সম্বন্ধে সর্ব্বপেক্ষা পণ্ডিত Sir Robert Austen, F. R. S. এদেশের mint এর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা! তিনি আজ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

---

* Sir willam Croks : রয়্যাল সোসাইটির তৎকালীন সভাপতি।

তিনি বলিলেন, আমি ৩০ বৎসর ধাতুর প্রকৃতি নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। আপনি যে-সমাচার সেদিন অকুতোভয়ে প্রচার করিলেন, ওরূপ একটা ধারণা অজ্ঞাত ও ঝাপসাভাবে আমার মন আক্রমণ করিয়াছিল। আমি ভয়ে ভয়ে একবার Royal Institution এ এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলাম এবং সেজন্য বহুরূপে তিরস্কৃত হইয়াছি। আপনি যেরূপ সাহসের সহিত এবং অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এ বিষয় প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে আমার অনেক দ্বিধা সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে।

তবে আমাকে নিজের কলের উপর নির্ভর করিয়া নিজ চেষ্টায় প্রমাণিত করিতে হইবে।

আমি নির্জ্জীবের যে-সব স্পন্দন-রেখা ফটোগ্রাফী দ্বারা অঙ্কিত করিতে পারিয়াছি তাহার দু'চারটি নমুনা পাঠাইতেছি, অন্যদিকে জীবিতের স্পন্দন-রেখার সহিত মিলাইয়া দেখিবে।

প্রকৃতিদেবী কি আমাদিগকে কখনও প্রতারণা করিয়া থাকেন? যদি তাহা না হয়, তবে এই দুই এক।

আরও অনেক বলিবার ও করিবার আছে, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। তোমার এই পুস্তকখানা দেখা হইলে ত্রিপুরার মহারাজকে আমার হইয়া পাঠাইয়া দিবে। তাঁহার উৎসাহ-বাক্যে আমি বিশেষ উৎসাহিত।

আমি এতদিন কল ও অন্যান্য জিনিষ স্থির করিবার পর হইতে কার্য আরম্ভ করিয়াছি। আমার একজন assistantকে এই ছয় মাসে সবে মাত্র কাজ সম্পূর্ণ করিয়া শিখাইয়াছি। এই সময়ে ত্যাগ করিয়া গেলে সমস্তই শেষ হইবে। আর আমার এই পূর্ণ হৃদয়ে এখন বাধা পাইলে আর কোন দিনও ফিরিয়া পাইব না।

তুমি যে-জন্য অনুরোধ করিয়াছ, দিন-রাত্রি কি আমার মনে সেই এককথা সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত হইতেছে না? তোমরা আমার সমস্ত বোঝা লইয়া আমাকে একাগ্রভাবে কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছ; তবে দ্বিধা করি কেন?

একথা যদিও সত্য বটে, যে, politicsএর জন্য Bhownagreeর জন্য ভারতবর্ষ হইতে ৩০০০ পাউণ্ড প্রেরিত হয়, আর আমাদের পূজনীয় নারোজীকেও ভারতবর্ষীয়েরা স্মরণ করিয়াছেন এবং তাহার জীবন নিরুদ্বেগ করিয়াছেন। আর তাতার University* র জন্যও এদেশ হইতে ২৫০০হইতে ১২০০মাসিক বেতনে ইংরাজ অধ্যাপক মনোনীত হইবে।

কিন্তু Politicsএর জন্য যেরূপ উৎসাহ, বিজ্ঞানের জন্য কি সেইরূপ উৎসাহ আছে? আর আমার জন্মভূমি বাঙ্গলাদেশও অতি দীন।

এজন্য দ্বিধা করিতেছিলাম। আরও মনে করিয়াছিলাম, যে তোমাদের নিকট হইতেই আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই, তোমাদের সাধুবাদও আমার জীবনের প্রধান গৌরব। যদি কোনদিন তাহা হইতে বঞ্চিত হই, তাহা হইলে আমার মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক যাতনা হইবে। কিন্তু তোমার লেখা হইতে আমি বুঝিলাম, যে, তোমাদের স্নেহ হইতে আমি কখনও বঞ্চিত হইব না। একথা আমাকে পুনঃ পুনঃ শুনাইও। আমার জীবনপ্রাণ দেশে ধাবিত হইতেছে, আমি অতিকষ্টে নির্ব্বাসন-কষ্ট ভুলিয়া থাকি।

তাতার University : বাঙ্গালোর ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স।

আমি এখানে গবর্ণমেন্ট্ হইতে মাসিক ৪৫ পাউণ্ড অর্থাৎ বাৎসরিক ৮১০০ টাকা+বৃত্তি ২০০০×Research এর জন্য ২৫০০ = ১২৬০০ টাকা পাই। আমার assistant এবং কল ইত্যাদির বাবত প্রায় ৪০০০টাকা খরচ হয়, আর বাকীতে আমাদের এখানকার খরচ অতি সাবধানে চালাইতে হয়। কারণ এখানে অনিবার্য্য বৈজ্ঞানিকদের সহিত মেলামেশার জন্য কিছু অধিক খরচ হয়।

আমি যে assistant কে তৈয়ারী করিয়াছি, তাহাকে যদি না রাখিতে পারি, তাহা হইলে সমস্ত কার্য্যই বিফল হইবে। কারণ আর নূতন কাহাকে শিখাইয়া লইতে আমার আর সহ্য হইবে না। যদি শীঘ্রই এদেশে ফিরিয়া আসা উচতি মনে কর, তবে ইহাকে বরাবরের জন্য নিযুক্ত করিতে হয়।

তোমার মিনির* বিবাহ হইল। কাবুলীওয়ালা তাহাতে উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছে।

তোমার
জগদীশ

তোমার মিনি : মাধুরীলতা দেবী (বেলা)। 'কাবুলিওয়ালা' গল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কাবুলিওয়ালা, বাস্তব ঘটনা নয়। মিনি কিছু পরিমাণে আমার বড় মেয়ের আদর্শে রচিত' [প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ : ৪৫১]

লন্ডন
৩০শে আগস্ট ১৯০১

বন্ধু,

তোমার পত্র হইয়া কিরূপ উৎসাহিত হইয়াছি বলিতে পারি না। আমি নানা চিন্তায় অবসন্ন, এক এক সময় মনে হয় কেবল কার্য্য লইয়া যদি থাকি তাহা হইলে আমার অন্যান্য কর্ত্তব্য কে করিবে? আমাকে নির্ম্মম হইতে হইবে; সমস্ত ভুলিয়া এক অভীষ্ট সাধন করিতে হইবে। তোমার চিঠি পাইলে আমার মনের অবসাদ অনেক দূর হয়।

তোমার 'জয়পরাজয়' গল্পটি আমাকে কিরূপ আবিষ্ট করিয়াছে, বলিতে পারি না। রয়্যাল ইন্‌ষ্টিট্যুসনের বক্তৃতার দিন যেন তাহারই অভিনয় হইতেছিল। যদি ভক্তের পূজা ভারতী গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে জয় পরাজয় আমার নিকট একই। তবে তোমরা যে আমার জন্য এত করিতেছ, তাহার জন্য আমার মন কখন অতি প্রফুল্ল, কখন একান্ত অবশ হয়। আমি কতটুকু করিতে পারিব? হয়ত অধিক করিতে পারিব না, এই মনে করিয়া কষ্ট পাই। তবে তুমি আমার শঙ্কা দূর কর। আর এক কথা— আমার ইষ্টাকাঙ্ক্ষী এদেশীয় বন্ধুগণ আমার নূতন কয়েকটি আবিষ্ক্রিয়া আমার স্বার্থের জন্য কিয়ৎ দিন অপ্রকাশিত রাখিতে পরামর্শ দিতেছেন, কেবল আমাকে যেন কোন দুর্দ্দিনে একেবারে গবর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী হইতে না হয়। কিন্তু আমি এইরূপ রুদ্ধজীবন লইয়া কাজ করিতে পারি না, আমার যাহা দিবার তাহা যেন আমি তোমাদের নামে দিতে পারি। Romeএ International Congress on Wireless Telegraphy হইতে অনুরোধ-পত্র আসিয়াছে, তাহাতে লিখিয়াছেন,— "আপনার কার্য্য হইতে অনেক উন্নতি আশা করি, আপনার উপদেশ এবং নতুন আবিষ্ক্রিয়াতত্ত্ব জানাইয়া উন্নতিবর্দ্ধন করিবেন।" আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত কর। আমি জীবনের বাকী কয়দিন যেন উন্মুক্ত প্রাণে কার্য্য করিতে পারি। তুমি আমাকে কয়মাসের জন্য আসিতে লিখিয়াছ, "সকল কথা পরিষ্কার রূপে আলোচনা করিয়া লইতে"। তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, যাহা ভাল মনে কর, আমার হইয়া কর। আমি কেবল এক কাজ বুঝি, আর বাকী সব তোমরা আমার হইয়া কর। আমি এখন ভাবে আবিষ্ট হইয়া আছি। তাহা যদি কিছুদিনের জন্য ছাড়িয়া দেই, তবে সূত্র পুনরায় ধরিতে পারিব কি না এই ভয় হয়। এই

দেখ, এইমাত্র একটি আশ্চর্য্য Experiment করিয়া আসিলাম, জন্তু এবং অ-জীবের মধ্যে ভয়ানক মস্ত একটা ব্যবধান, তাই সেতু বাঁধিবার জন্য উদ্ভিদের জীবন-স্পন্দন-রেখা আছে কি না তার চেষ্টা করিতেছিলাম। এইমাত্র অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষার ফল পাইলাম— এক ! এক ! সব এক ! উদ্ভিদকে মধ্যস্থলে দাঁড় করাইয়া আমি দুই দিকে আক্রমণ করিব— একই কল, একই লিখিবার যন্ত্র— কেবল এইমাত্র উদ্ভিদ, পর মুহূর্ত্তে জীবী, পর মুহূর্ত্তে অজীবীকে রাখিয়া দেখাইব— একই হস্তলিপি ! তুমি কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, ইহার অন্ত কোথায় ? কত বিজ্ঞান একভূত হইবে। বিষপ্রয়োগে কেন জীবনান্ত হয় ? 'বিষ খাইয়াছে— মরিয়াছে' সব গোলমাল চুকিয়া গেল। কিন্তু কেন মরিল ? কি মানবিক কলে চাবি পড়িল ? কেন পড়িল, চাবি কি ঘুরাইয়া দেয়া যায় না— কেন যাইবে না ? এসব কথা ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তোমার ডাক্তারী, তোমার ঔষধ ব্যবহারের কিছু অর্থ আছে ? কেন থাকিবে না ? অর্থ যদি বোঝা যায় তবে এইসব পরীক্ষা দ্বারা যাইবে। বন্ধু, আমি শত জীবনে ইহার চিন্তা করিতে পারিব না— আমি সব দেখিতেছি— কেবল সময়াভাব। আমি কি করিয়া এসব ফেলিয়া একদিনের জন্যও চলিয়া আসি ? এজন্য আমাকে একেবারে ছাড়িয়া দাও। কেবল তুমি কয়মাসের জন্য এখানে আইস। আমি ফর্লোর জন্য আবেদন করিয়াছি ; জানি না কি হয়। তবে Anglo-Indian member of Council এর মধ্যেও দুএকজন মানবিক ভাব একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাহার মধ্যে একজন আমাকে বলিয়াছেন, "আমি তোমার ছুটীর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব, For I think it will be a sin against Science to make you leave your work now"। তবে বিরুদ্ধবাদী অনেক আছেন। আর দেশে ফিরিয়া গেলে যে কিরূপ হইবে তাহা বেশ জানি।

আমি যদি কাজ ছাড়িয়া দেই তাহাও যেন সদ্ভাবে করিতে পারি। যে-পথ উত্তম, তাহাতে বিদ্বেষ নাই। তুমি আমাদের ভবিষ্যতের যে সংকীর্ণ পথের কথা বলিয়াছ, তাহাই মহৎ। বিদ্বেষ দ্বারা কোন কাজ হয় না। আমি তোমাদের পূর্ণ আশীর্ব্বাদ লইয়া সব করিতে সক্ষম হইব।

আর তুমি জান, সার্ জন উড়বার্ণ আমাকে সর্ব্বদা সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীদের হস্তেই আমাদের জীবনসংশয়। তুমি শুনিয়াছ কি, যে, প্রফুল্ল রায়কে* নাকি দূরে পাঠাইবার চেষ্টা হইয়াছিল ?

আজ এখানেই শেষ করি। আরও কত লিখিবার আছে। তুমি সর্ব্বদা লিখিও।* লোকেনের সহিত সাক্ষাৎ পাওয়া দুরূহ।

তোমার
জগদীশ

---

* প্রফুল্ল রায় : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)। স্বদেশী বিজ্ঞানী, বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা।

* লোকেন : স্যার তারাকানাথ পালিতের পুত্র রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণিকা' কাব্য লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে উৎসর্গ করে।

1, Birch Grove Acton
London W.
21st, March, 1902 (?)

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া আমি মুহূর্ত্তের জন্য এখানকার সংগ্রামক্ষেত্র হইতে তোমার শান্তিময় আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। ক্ষণেক কালের জন্য গভীর শান্তিতে হৃদয় পুর্ণ হইল। আমার সমস্ত হৃদয় মন তোমাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য আকুল। তুমি যাহা করিতেছ তাহাই শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে আগামীবারে অনেক লিখিব ! আজ আমার কর্ণে এখনও রণক্ষেত্রের দুন্দুভি বাজিতেছে, কারণ এইমাত্র আমি সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার জয়-সংবাদে সুখী হইবে।

তোমরা চিন্তিত হইবে বলিয়া আমি এখানকার সব কথা খুলিয়া লিখি নাই। ইয়োরোপের একজন প্রধান Physiology তে অগ্রণী, Burden Sanderson এর* নাম শুনিয়াছ। - Sanderson এবং Waller এই দুইজন Phyiology র উচ্চ সিংহাসন অনেককাল যাবৎ নির্ব্বিবাদে অধিকার করিয়াছিলেন।

আমি Royal Society তে যখন বক্তৃতা করি, তাঁহাকে দেখাই যে যদি নির্জ্জীব ও জন্তুর Responisive-ness এর একই আধার হয় তাহা হইলে মধ্যবর্ত্তী উদ্ভিদের responseও একই রকম হইবে। তাহাতে Burden Sanderson উঠিয়া বলিলেন, আমি উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে সমস্ত জীবন অনুসন্ধান করিয়াছি, কেবল লজ্জাবতী লতা সাড়া দেয় কিন্তু **that ordinary plants should give electrical response is simply impossible. *It Cannot be.*** আরও বলিলেন, **Prof, Bose has applied physiological terms in describing his physical effects on metals. Though his paper is printed yet we hope he will revise it and use physical terms and not use *our* physiological expressions in describing phenomena of dead matter.**

---

* **Burden sanderson** : স্যার জে. এস. বার্ডেন সেন্ডারসন (১৮২৮–১৯০৫)। অক্সফোর্ড ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

তাহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম Scientific terms কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, আর এই সব Phenomena এক সুতরাং আমি একের মধ্যে বহুত্ব প্রচারের বিরোধী।

ফল হইল যে আমার সেই Paper প্রকাশ বন্ধ হইল। কয়জন Physiologist এর প্রাণপণ চেষ্টায় Conspiracy of silence হইল। কারণ আমার এই থিয়োরী স্থির হইলে উক্ত বৈজ্ঞানিকদের theory একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহারা মনে করিলেন, আমার দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী; একবার আমি সমুদ্র পার হইলে বিপদ কাটিয়া যাইবে।

তখন তোমাদের উৎসাহে এখানে থাকা স্থির করিলাম। কিন্তু কি করিয়া আমার experiment প্রকাশ করিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। এবিষয়ে একেবারে নিরাশ্বাস হইয়াছিলাম। কারণ "whom are we to believe -- -Physiologists who have grown grey in working out their special subjects --- or a young *Physicist* who comes all of a sudden to upset all our convictions ?" সাধারণের মত এইরূপ ছিল।

ইতিমধ্যে Linnean Societyর President, Prof. Vines এর সহিত আমার দৈবক্রমে দেখা হয়। ইনি আধুনিক Vegetable Physiologist এর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। আর Linnean Society, Biology সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান Society। Prof. Vines একদিন Prof. Hornes (successor of Huxley at the Royal college of Science) কে সঙ্গে করিয়া আমার experiment দেখিতে আসেন। তাঁহারা এই সব দেখিয়া কিরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন তাহার বলিতে পারি না। Prof. Hornes পুনঃপুনঃ বলিতেছিলেন, "I wish Hixley had been living now, he would have found the dream of his life fulfilled."

তাহার পর Vines, as President of Linnean Society, আমাকে উক্ত সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন।

সমবেত Physiologist-Biologist প্রমুখ বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী, তাহার মধ্যে তোমার বন্ধু একাকী এই প্রতিপক্ষকুলের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত। ১৫ মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে রণে জয় হইয়াছে। Bravo ! Bravo ! ইত্যাদি অনেক উৎসাহবাক্য শুনিলাম। বক্তৃতার পর President তিনবার উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার আছে কি? একেবারে নিরুত্তর। তাহার পর Prof. Hartog উঠিয়া বলিলেন, যে, we have nothing but admiration for this wonderful piece of work. President ও অনেক সাধুবাদ করিলেন।

সুতরাং এতদিন পর আমার এই প্রথম সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আরও এখন অনেক করিবার আছে। আমি কি করিব বুঝিতে পারি না। আমি একান্ত শ্রান্ত, এবং আমার সমস্ত মন এখন নির্জ্জনে যাইবার জন্য ব্যাকুল।

কিন্তু আমি যে অগ্নি জ্বালাইয়াছি তাহার ইন্ধন আরও অনেক দিন জোগাইতে হইবে।

তুমি মহারাজাকে আমার এই সংবাদ জানাইও। তোমরা যদি আমার এখানে থাকিবার উপায় না করিতে— তাহা হইলে আমাকে নিস্ফলপ্রয়াস হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত।

বন্ধু, আমার পরিপূর্ণ হৃদয়ের ভালবাসা প্রেরণ করিতেছি।

তোমাদের
জগদীশ

তোমার জন্য John Chinaman পাঠাইতেছি। পড়িয়া দেখিও। আমরা স্বর্ণ ফেলিয়া ইয়োরোপীয় ভস্ম লেপন করিতেছি।

পারিস
৮ই এপ্রিল ১৯০২

বন্ধু,

সারাদিন ঝঞ্ঝাট, দুদণ্ড তোমার সহিত আলাপ করিবার সময় পাই না। সন্ধ্যার পর বাহিরের আঁধারের সহিত অন্তরের আলো জ্বলিয়া উঠে। তখন আমি জন্মভূমির কোলে স্থান পাই।

ছেলে-বেলা ইংরেজি শিক্ষার সহিত যে পাক পড়িয়াছিল, এতদিনে তাহা আস্তে আস্তে খুলিয়াছে, এখন স্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া সব দেখিতে পারিতেছি। পশ্চিমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সব দেখিতে পাইয়া অনেক মোহ দূর হইয়াছে। তবে পরের দোষ দেখিয়া আমাদের কি লাভ? কি করিয়া আমরা বিলাসের পথ হইতে উদ্ধার পাইব?

সচরাচর শুনিতে পাই হিন্দু স্বভাবতই সংসারবিমুখ, জীবনের সংগ্রাম হইতে পলাতক। একথা কি ঠিক? হিন্দুরা কি সমস্ত জীবন শক্তি দিয়া অভীষ্টের অনুসন্ধান করেন নাই? এত জ্ঞান আহরণ কি বিনা চেষ্টায় হইয়াছে? শঙ্করাচার্য্যের বিজয়-যাত্রা কোন অংশে যুদ্ধযাত্রা অপেক্ষা কম? এরূপ শারীরিক ও মানসিক শক্তির চরম প্রয়োগ একালে কি দেখা যায়?

তবে হিন্দু চিরকাল আসক্তিহীন। "আমি" কেহই নই, "যিনি আমাকে চালাইতেছেন তিনিই সব।"

তিনি বিশ্বকর্ম্মারূপে আমাদের হৃদয় মন পরাস্ত করিয়াছেন। আবার সখারূপে অতি সন্নিকটে। যিনি আমাদিগকে প্রেমপাশে বাঁধিয়াছেন তাঁহার চরণে প্রতিমুহূর্ত্তে আত্মবলি দিতে হৃদয় উৎসুক। সুখের দিনে কিছু জানাইতে পারি না। কিন্তু দুঃখের দিনে একটু জানাইতে পারি। তিনি আমাদিগকে যেখানে রাখিয়াছেন, দাস সে স্থানেই থাকিবে, সমস্ত কলঙ্ক বহন করিবে, সমস্ত নিষ্ফলতার মধ্যে সমস্ত চেষ্টা নিবেদন করিবে। আমাদের শক্তিই বা কি, কিন্তু কোটি কোটি ক্ষুদ্র প্রবাল-পঞ্জরে মহাদেশ গঠিত হইয়াছে। এই ত আমাদের একমাত্র আশা। যে মৃত্তিকাতে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে সেই জন্মভূমির জন্য আমাদের দেহ মন পর্য্যবসিত হয় ইহা ব্যতীত ত আর আমাদের করিবার নাই।

তোমার আশ্রমের কুমারগণ যেন আমাদের চিরন্তন এই নিরাসক্তি লইয়া জীবনে প্রবেশ করিতে পারে। সংসারে যাইয়া যেন এই ভাব লইয়া সমস্ত প্রাণ মন দিয়া নিয়োজিত কার্য্য করিতে পারে। তারপর জীবনের সন্ধ্যায় পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়া আসিবে।

আমি লন্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার তিন জায়গায় বক্তৃতা ছিল, সকল স্থানেই বক্তৃতা সুসম্পন্ন হইয়াছে। সকলে অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছেন, এবং আরও জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এতবড় বিষয়টা ২/৪ দিনের সম্পূর্ণরূপ প্রকাশ ও প্রচার করিবার আশা করি না। তবে Germany হইতে যাইবার জন্য অনুরোধ আসিয়াছে।

তুমি মনে কর যে আমি সর্ব্বদাই কর্ম্ম-সাধনে উন্মুখ। তুমি যদি জানিতে যে প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে নিজের সহিত কত সংগ্রাম করিতে হয়। আমার মন সর্ব্বদা ছুটিয়া যাইতে চাহে, এই অবিরাম যুঝিয়া আমি ক্লান্ত হইয়াছি। স্বভাবের ক্রোড়ে, যেখানে সমস্ত নিস্তব্ধ, সমস্ত শান্তিময়, সেখানে মন ছুটিয়া যায়। তোমরা যদি নিরাশ্বাস হও তবে আমি একা যুঝিয়া কি করিব? আমি সম্মুখে বড় বিভীষিকা দেখিতেছি। আমেরিকান্‌রা এদেশে আসিয়া সমস্ত বাণিজ্য, Manufacture ইত্যাদি কাড়িয়া লইতেছে। এদেশের তাড়িত লোকের ধাক্কা আমাদের উপরে পড়িবে। যদি একে একে উপায় পরহস্তগত হয়, তাহা হইলে নির্লোপ হইবার বেশী দেরী নাই। কি করিয়া পরমুখাপেক্ষী না হইয়া লোকে স্বাধীন উপায় অবলম্বন করিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিও। জাপানের সমৃদ্ধি কেন বাড়িতেছে? আমি ত উক্তদেশের অনেককে দেখিয়াছি। আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে আমাদের দেশে অন্য দেশের সহিত তুলনা করিলে তপস্বীর অভাব দেখা যাইবে না। আমাদের কি ভবিষ্যতে কিছুই আশা নাই? চিরকালই কি মাথা নোয়াইয়া থাকিতে হইবে? এতকাল কথা ছিল যে ভারতে বিজ্ঞান অসম্ভব, এখন কথা হইবে দৈবাৎ এক আধটা instance ধর্ত্তব্য নয়। এমন কি Prof. Ramsay আমাকে বলিলেন, your case is an exception, one swallow does not make a summer!

অবশ্য ইচ্ছা করিলে এ সমস্ত ভুলিয়া থাকা যায়। একটা জীবন বইত নয়, আর কত দিনই বা। এ সংসারের শেষ হইলে কি মায়া যায়? এই একটা স্থানবিশেষের জন্য মমতা হয়ত মায়া মাত্র।

তোমাকে আর কি লিখিব?

তোমার জামাতাকে দেখিয়া সুখী হইয়াছি, তাহাতে মনুষ্যত্ব আছে। তাহার দ্বারা তুমি সুখী হইবে। এখানকার ইঙ্গবঙ্গের হাওয়া বাছাকে স্পর্শ করে নাই।

তোমার
জগদীশ

লন্ডন
১লা মে ১৯০২

বন্ধু,

তোমার পত্রের প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম, আজ পাইয়া বড় সুখী হইলাম। তোমার নিকট কত বিষয় বলিবার আছে, কিন্তু পত্রে কথা পরিস্ফুট হয় না। উৎসাহ কিম্বা অবসাদের সময়ে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে। অধিকাংশ সময়েই অবসাদ, সুতরাং তোমার সান্নিধ্য অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়। সেদিন তোমার কতগুলি কবিতা পড়িতেছিলাম, সেই শিলাইদহের প্রান্তর ও নদী, সেই আকাশ ও বালুর চর আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। বলিতে পার কি এই হৃদয়ের আকর্ষণের অর্থ কি? তোমার কি মনে হয় যে এই পৃথিবীর ছায়ার অন্তরালে আত্মা আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যায়?

তুমি ত এতদিন নির্জ্জনে সাধনা করিয়াছ, বলিতে পার কি, কি করিলে সুখ দুঃখের অতীত হইতে পারা যায়? একদিন ভারতে সুদিন আসিবেই, কিন্তু একথা সর্বদা মনে থাকে না। ইহা যে সত্য, একথা আমার মনে মুদ্রিত করিয়া দাও। একটা আশা না থাকিলে আমার শক্তি চলিয়া যায়।

তোমার
জগদীশ

৮ই মে

বন্ধু,

তুমি আমার নিকট উপস্থিত হও। আমি কি কষ্টের ভিতর দিয়া যাইতেছি তুমি জানিবে না। তোমরা নিরাশ হইবে একথা মনে করিয়া আমি এখানে কিরূপ বাধা পাইতেছি তাহা জানাই নাই। তুমি মনেও করিতে পার না। এই যে Royal Society তে গত বৎসর মে মাসে Plant Responseসম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, তাহা waller ও Sanderson চক্রান্ত করিয়া Publication বন্ধ করিয়া দিলেন। আমার সেই আবিষ্কার চুরী করিয়া Waller গত নবেম্বর মাসে এক কাগজে বাহির করিয়াছেন। আমি এতদিন জানিতাম না। আমার Linnean Societyর paper ছাপা হইবার কথা যখন Council এ উঠে তখন Waller এর বন্ধুরা তথায় আমার Paper বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন— এই বলিয়া, যে Waller গত নভেম্বরে একথা Publish করিয়াছেন! Council এর কথা Confidential, সুতরাং এসব চক্রান্ত আমি জানিতাম না। আর Royal Society র Paper বাহিরে প্রচার হয় নাই সুতরাং প্রমাণাভাবও বটে। ভাগ্যক্রমে আমার Royal Institution এর Lectureএ একথা ছিল, এবং দৈবক্রমে Linnean Society র সেক্রেটারীর কাছে আমার উক্ত কাগজ ছিল। অনেক ঝগড়ার পর শুনিতে পাইতেছি যে, আমার কাগজ ছাপা হইবে।

President আমাকে লিখিয়াছেন "there are many queer things you have yet to learn. But I am glad that you now have had fairplay." তাঁহার নিকট আরও অনেক কথা শুনিলাম। সে সব কথা বলিয়া আর কি হইবে? Ideal ভাঙ্গিয়া গেলে আর কি থাকে! এতদিন এদেশের বিজ্ঞান-সভায় অনেক বিশ্বাস করিয়াছি —তাহা দূর করিয়া লাভ কি? অধিক দিন থাকিতে পারিলে আমি একাই ব্যূহ ভেদ করিতাম— কিন্তু আমার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি একবার কদিন আসিয়া ভারতের মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া জীবন পাইতে চাই। তাহার পর যদি পুনরায় আসিতে পারি তবে— ভবিষ্যতের কথা আর ভাবিব না।

তোমার
জগদীশ

লন্ডন
৩০শে মে, ১৯০২

বন্ধু,

এতকাল কেবল কর্ম্মসংবাদ লিখিয়াছি। একদিনও মন খুলিয়া চিঠি লিখিতে সময় পাই নাই। আজ আর-সব কথা ভুলিয়া তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। এক এক সময় মনে হয় দূর হউক দুঃখের কথা— মানুষের হৃদয় বলিয়া ত একটা জিনিস আছে। সন্ধ্যার পর তোমার ঘরে যেন বসিয়াছি। আমার ক্রোড়ে আমার ছোট বন্ধুটি বসিয়া আছে, অদূরে বন্ধুজায়া, আর তুমি তোমার লেখা পড়িয়া শুনাইতেছ। আমি তোমার লেখাগুলি পড়িতেছিলাম, তোমার স্বর যেন শুনিতে পাইতেছি। তুমি যে কালিদাসের সময়ের কথা লিখিয়াছ, মনে হয় যেন পূর্ব্বজন্মের কথা শুনিতেছি। সে সব দিনের কথা স্মরণ করিয়া মন কেমন পুলকে বিহ্বল হয়। এরূপ মধুর স্মৃতি, এরূপ উজ্জ্বল সরল প্রেম, এরূপ সুখ, এরূপ কল্যাণ, অন্য কোন জাতিতে কি কখনও ছিল? তোমার আর একটি কথা আমার নিকট বড়ই ভাল লাগিয়াছে— সেকথা কল্যাণী— তুমি ঠিকই বলিয়াছ একথার অর্থ অন্য ভাষায় প্রকাশ পায় না।

তুমি নগর হইতে দূরে যে আশ্রম স্থাপন করিয়াছ, সেখানে কবে আসিতে পারিব মনে মনে কল্পনা করিতেছি। তারপর তোমার কল্পনার সাহায্যে সেই অতীত সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে। আমার নিকট এই বর্ত্তমান ত একেবারে অলীক দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কল্পনারাজ্যেই আমাদের প্রকৃত জীবন।

তোমার এই নুতন স্থান কিরূপ মনে করিতে পারি না। আমার স্মৃতি শিলাইদহে আবদ্ধ। সেখানে কি ফিরিয়া যাইবে না? অন্ততঃ আমার সঙ্গে একবার যাইবে। আর একবার একত্র তীর্থযাত্রা করিব।

তোমার 'চোখের বালি' বৈশাখ মাস পর্যন্ত দেখিয়াছি। বেশ লাগিয়াছে। ভয় ছিল তুমি যেরূপ অবস্থায় ফেলিয়াছ তাহাতে কি করিবে। কিন্তু সবই সুন্দর হইয়াছে।

আমার এখানকার কাজের সংবাদ ভালই। স্রোত বোধ হয় অনুকূলেই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেদিন Linnean Societyর বাৎসরিক অধিবেশনে আমার কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা হইয়াছে। যদি অধিক দিন থাকিতে পারি তাহা হইলে সবই অনুকূল হইতে পারে

বলিয়া মনে হয়। তবে জয়পরাজয় জোয়ার-ভাটা। Germanyর Bonn University তে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ আসিয়াছে। তোমাদের প্রতিনিধির উপর একটু সদয় হইও। তোমাদের নিকট একটু উৎসাহ পাইবার জন্য মাঝে মাঝে যে অবসাদ আসে তাহার কথা লিখিয়াছিলাম, আর অমনি তুমি বলিয়া বসিলে সীজারের নৌকাডুবি কখনও হয় না। একবার সমুদ্রে পড়িলে বুঝা যাইত নৌকাডুবি হয় কিনা। তুমি কি মনে কর যে আমি এক কেষ্ট বিষ্টু হইয়াছি। গলায় পাথর বান্ধিয়া জলে ফেলিলে ভাসিয়া উঠিব? দোহাই এরূপ কবি-কল্পনা হইতে আমাকে রক্ষা কর।

আগামী সপ্তাহে Photograhic Societyতে বক্তৃতার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি— দৃষ্টি ও ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে বলিতে হইবে। চক্ষে যে-ছায়া পড়ে তাহা মিলাইয়া যায়, কেবল তাহার প্রতিধ্বনি সুপ্ত ও জাগরিত স্মৃতিরূপে থাকিয়া যায়। কিন্তু photoর ছবি একবারে অপরিবর্ত্তিত রূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। কি করিয়া সেই আণবিক আড়ষ্টতা (molecular arrest) সাধিত হয় তাহার সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য experiment সফলতা লাভ করিয়াছি। হঠাৎ মনে হইল, তুমি আমার আবিষ্কার চুরী করিয়া ইতিপূর্ব্বে কবিতারূপে প্রচাব করিয়াছ। সুরদাস যখন তাহার চক্ষু শলাকাবিদ্ধ করিতে যাইতেছিল তখন তাহার মনে হইল যে, চির-অন্ধকারে পলকহীন স্মৃতি চিরমুদ্রিত থাকিবে।

তোমার

লন্ডন
২৭ এ জুন, ১৯০২

বন্ধু,

তোমার আহ্বান আমাকে দেশের দিকে টানিতেছে— শীঘ্রই তোমাদের সহিত দেখা করিব, এই মনে করিয়া মন উৎসাহে পূর্ণ হইতেছে।

তুমি যাহার সূত্রপাত করিতেছ তাহাই আমাদের প্রধান কল্যাণ। আমাদের সাম্রাজ্য বাহিরে নয়, অন্তরে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ—ইহার অর্থ বুঝিতে অনেক সময় লাগে। নিরাশার কথা শুনিয়া যশ ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু তোমার নিকট উৎসাহের কথা শুনিয়া বড়ই আশান্বিত হইয়াছি। ভারতের কল্যাণ আমাদের হাতে, আমাদের জীবন দিয়া আমাদের আশা, আমাদের সুখ-দুঃখ আমরাই বহন করিব। মিথ্যা চাক্‌চিক্যে যেন আমরা ভুলিয়া না যাই ; যাহা প্রকৃত, যাহা কল্যাণকর তাহাই যেন আমাদের চিরসহচর হয়। বিদেশে যাহা উন্নতি বলে, তাহার ভিতর দেখিয়াছি। আমরা যেন কখনও মিথ্যা কথায় না ভুলি— 'পুণ্যই' আমাদের প্রধান লক্ষ্য। অন্তরে কিম্বা বাহিরে প্রতারণা দ্বারা আমরা কখনও প্রকৃত ইষ্ট লাভ করিব না।

আমি একবার মনে করিতেছি, শীঘ্রই দেশে আসিব। আবার মনে হইতেছে, আর কয়মাস থাকিয়া আমার মত প্রচার করিয়া ফিরিব। এতদিন সংগ্রামে বিক্ষুব্ধ ছিলাম ;— তুমি শুনিয়া সুখী হইবে সর্ব্বত্রই জয়-সংবাদ। তোমার নিকট তিনখানা পুস্তিকা পাঠাই। তারিখ দেখিলে বুঝিবে ইহা এক বৎসর পূর্ব্বে পঠিত হয়, এক বৎসর পরে গৃহীত হইল। জড়ের স্পন্দন সম্বন্ধে গত বৎসরের ঘটনা জান। পুনরায় এ বৎসর Royal Societyতে আসিয়াছিলাম। এবার অনেক তর্কের পর আমার মতেরই জয় হইয়াছে— R. Society সত্বরই তাহা প্রচার করিবেন। Linn. Society উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে আমার আবিষ্কার প্রকাশ করিবেন। ইতিমধ্যে Royal Photographic Society হইতে আহুত হইয়া photography সম্বন্ধে আমার নূতন মত্ বিষয়ে বক্তৃতা করি, তাহাতে অনেকে নূতন তত্ত্বে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছেন। President বলিয়াছেন, It will Produce a revolution about our ideas of photography। আমি সম্প্রতি বিনা আলোকে ছবি তুলিতে সমর্থ হইয়াছি। বন্ধু, আমি একবার নূতন নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া বিহ্বল হইয়াছি। ইহার অন্ত কোথায়? মানুষের মন যে আর ধারণা করিতে পারে না।

তোমার
জগদীশ

১৮ই জুলাই, ১৯০২

বন্ধু,

সোমবার দিন তোমার পত্রের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, পাইয়া সুখী হইয়াছি।

তুমি লিখিয়াছ যে, আমরা ক্রমাগত এই সংসারের পাকে ঘুরিতেছি, একথা ঠিক্। মাঝে মাঝে এই আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া প্রকৃতের সন্ধান পাই। রৌদ্র ও মেঘের ছায়া ক্রমাগত আমাদের হৃদয়পটে একে অন্যের অনুধাবন করিতেছে।

ইহার মধ্যে থাকিয়াই যাহা করিবার করিতে হইবে।

অনেক অকাজ লইয়া কখন কখন প্রকৃত কার্য্যের অনুসন্ধান পাইব।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের জাতীয় জীবনে পুরাতন কাল হইতে যে এক ছাপ পড়িয়াছে তাহা কখনও মুছিয়া যাইবে না। তাহা হইতে আমরা প্রকৃত ও অপ্রকৃতের ভেদ বুঝিতে পারিব। সহস্র অজানার মধ্যেও আমাদের মন চিরন্তনের দিকে উন্মুখ থাকিবে।

সেই চিরন্তন সত্য ভারতের প্রতি গহন ও গিরিগহ্বর হইতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। কথার জাল ও অকর্ম্মের জাল আমাদিগকে চিরকাল বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। দুইদিন পরে অকৃতার্থতার জন্য আমরা বিমুর্ষ হইব না।

তবে একটা সামঞ্জস্যের আবশ্যক। তোমাকে যিনি গান গাহিবার জন্য পাঠাইয়াছেন, তুমি তাঁহারই জন্য গান গাহিবে। ইহাই তোমার মন্ত্র। এই অস্ফুট ভাষাতেই তুমি জীবন স্ফুটিত করিবে।

আমাদের যাহার যা-কিছু শক্তি আছে তাহাই যেন নিয়োজিত করিতে পারি। আমাদের সমস্ত শক্তি অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু যাহা কিছু আছে তাহাই যেন পূজার জন্য দিতে পারি।

কিন্তু বলা ও কার্য্যের আড়ম্বরে যেন আমরা প্রকৃত ভুলিয়া না যাই। এজন্যই তুমি যে-আশ্রম করিয়াছ তাহার দিকে আমার মন আকৃষ্ট হইয়াছে। মাঝে মাঝে সেখানে যাইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিব। কেবল বাহির লইয়া থাকিবার বিড়ম্বনা এদেশে দেখিতেছি। বাহির ও অন্তরের সামঞ্জস্য কি করিলে হয় তাহা আমাকে জানাইও।

আমার পুস্তকের শেষ প্রুফ লইয়া ব্যস্ত আছি। আর ৩/৪ সপ্তাহে পুস্তক মুদ্রিত হইবে। প্রুফ দেখিবার সময় গত দুই বৎসরের দারুণ সংগ্রামের কথা মনে হইয়া একান্ত ক্লিষ্ট হই।

আমার এই দীর্ঘ যন্ত্রণার ফল যেন তোমাদের গ্রহণীয় হয়। মনে করিয়াছিলাম উৎসর্গপত্রে লিখি—

To my countrymen
Who will yet claim
The intellectual heritage
Of their ancestors.

কিন্তু বন্ধু, এমন কথা বলিতেও লজ্জিত হইতে হয়। তোমরা আমার হৃদয়ের কামনা বুঝিয়া লইও।

এই সঙ্গে ক্ষুদ্র দুইখানা পুস্তিকা পাঠাই।

আরও দুএকটি নূতন বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু অনিশ্চিততার মধ্যে মনের দৃষ্টি যেন চলিয়া গিয়াছে।

তোমার
জগদীশ

লন্ডন
৫ ই সেপ্টেম্বর, ১৯০২

বন্ধু,

অনেক দিন পরে তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। এতকাল চিঠি না পাইয়া চিন্তিত ছিলাম। তোমার অসুখ সারিয়াছে শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।

কবি চির-যৌবন লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং জরা তোমাকে স্পর্শ করিবে না।

তোমার সহিত কত বিষয় বলিবার আছে তাহা অনেক দিনেও ফুরাইবে না। তোমার গৃহে আমার জন্য একটুকু স্থান রাখিও। বাহিরের কোলাহল, মিথ্যা বাদ-বিসংবাদ হইতে পলায়ন করিয়া তোমার সহিত প্রকৃতের অন্বেষণ করিব।

এ কয়মাস জার্ম্মেনী ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। তথায় যাইতে হইলে আর-এক বৎসর ছুটি লইতে হয়। ইণ্ডিয়া অফিসে সে-বিষয়ে বড় উৎসাহ পাইলাম না, অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেও রুচি হইল না। একবার ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় দীর্ঘ প্রবাসের জন্য বাহির হইব, এই আশা করিতেছি। অন্য কারণেও ইহা শ্রেয়ঃ। কারণ, এখানে যে-বাধা পাইয়াছিলাম, এখানে থাকিয়াই তাহা ভগ্ন করিব। আমার প্রতিযোগীদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে না পারিলে আমি শান্তি পাইতাম না। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে, এতদিনের বিরুদ্ধগতি অনুকূল হইয়াছে। সে-দিন Nature-এর leading articleএ লিখিত ছিল, The Eastern mind coming fresh and untrammelled to the work has taught us, etc. Royal Society এখন আমার দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। British Association হইতে সসম্মানে আহুত হইয়াছি। Botanical Section-এর President লিখিয়াছেন—

"আমি Plant Physiology সম্বন্ধে যে-পুস্তক লিখিয়াছি, তাহা অপূর্ণতা দ্বিতীয় সংস্করণে আপনার আবিষ্ক্রিয়ার দীর্ঘ বিবরণ দিয়া পূরণ করিব।"

নূতন বিষয় অভ্যস্ত হইতে কতকটা সময় লাগে, সুতরাং সম্মুখের বৎসরে তাহা অভ্যস্ত হইলে আরও নূতন তথ্য প্রচারের সহায়তা হইবে। নতুবা অনেকগুলি নূতন বিষয় একবার গ্রহণ করিতে মানসিক জড়তা বাধা দেয়।

এই চিঠি পাইবার পশ্চাতে তোমাদের মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইবে। ১৯ এ সেপ্টেম্বর রওনা হইব, কলিকাতা ৫ই কি ৬ই অক্টোবর পৌঁছিব। বোম্বাই হইতে তোমাকে Telegraph করিব। তোমার সহিত যেন অগৌণে দেখা হয়।

দুই বৎসরের পর তোমাদের সহিত দেখা হইবে। তোমাদের শুভ ইচ্ছা আমাকে সর্ব্বদা সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। তোমাদের শুভ ইচ্ছা যদি কিয়ৎপরিমাণে পূরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে সুখী হইব।

তোমার
জগদীশ

অনেকগুলি নূতন কবিতা ও গল্প ফরমাইস রহিল।
আমার ক্ষুদ্র বন্ধুটিকে ক্রোড়ে লইয়া সুখী হইব।

২৯-৬-১৯০৪

বন্ধু,

তোমার শারীরিক অবস্থা কিরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে-সম্বন্ধে যে নিরুত্তর ! ইহার অর্থ কি ? তুমি যদি সম্পূর্ণরূপ সারিয়া না আইস তবে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া আছে।

তোমার সহিত দেখা কবে হইবে ? আমার মনটা একটু বিষণ্ন আছে, একটা বড় কিছু লইয়া এখন থাকিতে চাহি, আমার নিজের কাজ ত একরূপ বন্ধ। কারণ ১৯টি Papers লিখিয়াছি, তাহার একটাও প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না, কি হইল তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। বই লিখিব মনে করি, কিন্তু সেই পুরাতন লেখা এখন দেখিতে ইচ্ছা করে না।

ভাল কথা, আমার যে প্রতিদ্বন্দ্বী, আমার আবিষ্ক্রিয়া চুরী করিয়াছিল, সে একখানা পুস্তক লিখিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে যে, পূর্ব্বে লোকে মনে করিত যে, কেবল sensitive plant এ সাড়া দেয় ; "But these notions are to be extended and we are to recognise that *any* vegetable protoplasm gives electric respones."

"I have used all kinds of vegetable protoplasms."

"We are to recognise" ; কাহার discoveryর দ্বারা ইহা হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

তারপর আমার পুস্তকে Physiologistদের একটা প্রকাণ্ড ভুল ধরিয়া দিয়াছিলাম— আমার আবিষ্কার হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, তাহাদের গোড়ায় গলদ— যাহা তাহারা negative বলে তাহা Positive। ইহা অপেক্ষা সাংঘাতিক আর কি ভুল হইতে পারে? তাহার উত্তরে প্রতিদ্বন্দ্বী লিখিয়াছে (আমার নাম করিতে নাই—আমার নাম physicist)!

"But in the Present state of our physiological literature, is it wise to attempt to use the proper expression? No doubt the confusion is very great, no doubt the main bulk of our electro-physiological literature is totally unintelligible to physicists. Shall we not, however, lay the foundation of a further mass of worse-confounded confusion by any sudden and unauthorised endeavour to call white white and black black, when for the last twenty of thirty years our leaders have been content to call white black white?"

আমরা এতদিন Whiteকে Black বলিয়াছি। Unauthorised Physicist আসিয়া আমাদিগকে শিখাইতে চায় white is white ! কি ভয়ানক !

তুমি কি মনে করিতে পার, বিলাতের বিজ্ঞান এখন কিরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে?

ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে যে, কিরূপ বাধার সহিত আমায় সংগ্রাম করিতে হয়। এসব কথা তোমাকে লিখিয়া, বোঝা অনেকটা দূর হইল, কয়দিন পর পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিব।

স্কুলের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। ভাল কথা, সেদিন আমার কোন বিশেষ বন্ধু তাঁহার সন্তানের শিক্ষার জন্য আমার পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। দেশী লোকদের জন্য ৫টাকার পরিবর্ত্তে ১০টাকা বেতন St. Xaviers এ ধার্য্য হইয়াছিল। ইহাতে দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ পরম সৌভাগ্য মনে করিতেছিলেন। এখন সরকার হইতে হুকুম আসিয়াছে যে, দেশীয় দিগকে যেন আর না ভর্ত্তি করা হয়। Loretto হইতে— এর চিঠি আসিয়াছে মেয়েগুলিকে দূর করিবার জন্য। এখন কথা, কোন নেটিভ্ স্কুলে ছেলে-মেয়ে দেওয়া যায়। হায়, এত অপর্য্যাপ্ত রাজভক্তির এই পুরস্কার !

মায়াবতীতে একজন আমেরিকান্ আসিয়াছে, সে কল-কারখানায় বিশেষ মজবুত। আমার ইচ্ছা তুমি শীতকালে কয়মাসের জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্কুলে আনাও।

সদানন্দ * মৃতপ্রায় হইয়া আসিয়াছেন। দিন* ও রথীর কি পরিবর্ত্তন দেখিলে? সদানন্দ তোমার উৎসাহপূর্ণ চিঠির জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন। বুঝিতে পারিলাম যে, শেষ মুহূর্ত্তে অনেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার জন্য খরচ অনেক বেশী লাগিয়াছে।

Sister নিবেদিতা ও Christine তোমার বাড়ীতে স্কুল খুলিবার জন্য বিশেষরূপে লাগিয়াছেন। তবে ছাত্রী জোগাড় কি করিয়া করিবেন জানি না—আর টাকাও দরকার মনে হয়। নিবেদিতা আশা করিতেছেন যে তাঁহার নূতন পুস্তক বিক্রয় দ্বারা এই অভাব কতটা দূর হইবে। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে, বিলাতে Web of Indian Life পুস্তকের বহু প্রশংসা হইতেছে— ভারত-বিদ্বেষী কাগজেও লিখিতেছে যে Kipling ইত্যাদির ভারতবর্ষের চিত্র হয় ত ঠিক নয়, ভিতরের যথার্থ চিত্র এইরূপই হইবে। সম্ভবতঃ এই পুস্তক বহুল প্রচার হইবে, আমেরিকান্ এডিশন্ ইহার মধ্যেই বাহির হইয়াছে। তবে Publisherএর নিকট হইতে পয়সা আদায় করা কঠিন।

বঙ্গদর্শনের ইউনিভারসিটির বিল পড়িয়া সুখী হইয়াছি। ভাষার ইঙ্গিতে অতি সুন্দর হইয়াছে।

তোমার

---

* সদানন্দ : স্বামী সদানন্দ। ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বসুর ভ্রমণ সঙ্গী হয়েছিলেন।
* *দিনু : দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র।*

২৩ এ অক্টোবর ১৯০৫

বন্ধু,

তোমাকে একটা বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথম আমাদের বঙ্গভবন* প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। একটি মূর্ত্তিমান এবং বর্দ্ধমান জিনিষ আমাদের উৎসাহের প্রধান সহায় হইবে। তারপর এই স্থানে কেন্দ্র করিয়া যত বড় কাজ আরম্ভ হইবে। এই স্থানে ৫০০০ লোকের বসিবার হল যেন নির্ম্মিত হয়। সেখানে প্রতি পক্ষে নিয়মিতরূপ ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা, কথকতা প্রভৃতি হইবে। তারপর আমাদের সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা এখানে নিয়মিতরূপ দেওয়া হইবে। এ বিষয়টি অতি গুরুতর, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রদিগকে বহিষ্কার জন্য বিবিধ সাংঘাতিক চেষ্টা হইতেছে ইহার প্রতিবিধান একান্ত আবশ্যক।

তারপর জাতীয় ভবনে তোমার সমাজের অধিবেশন হইবে, নানা বিভাগে শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদির জায়গা থাকিবে।

চাঁদা তুলিয়া কাপড়ের কল ইত্যাদি করিবার চেষ্টা ভুল। এই কেন্দ্র হইতে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান, সংবাদ ইত্যাদির দরকার।

এখানে রামমোহন রায়, বঙ্কিম, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, ইত্যাদির স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে, ইত্যাদি।

তুমি এ বিষয়ে অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রস্তুত করিবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন নানা স্থানে পঠিত হইবে।

এ সময় আমাদের বিজ্ঞজনেরা বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিবেন এবং ঘুমাইবার পরামর্শ দিবেন। এখনই জাগ্রত থাকিবার সময়। তোমাকে চোকিদারী করিতে হইবে।

তোমার

বন্ধু

---

* বঙ্গভবন : ফেডারেশন হল বা অখণ্ড বঙ্গভবন। ১৯০৫ সনের ১৬ অক্টোবর এই অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আনন্দমোহন বসু।

London
19th Dec. 1907.

আমার বন্ধু,

তোমার এই শোকের সম* য় কেবলমাত্র আমার হৃদয়ের বেদনা জানাইতেছি। তোমার সুখদুঃখের সাথী আমি। কি করিয়া তোমাকে সান্ত্বনা দিব জানি না।

আমাদের দুজনেরই অনেক প্রিয়জন পরপারে। সুতরাং সেদেশ আর দূরদেশ মনে হয় না।

কেবল এ কয়দিনে যথাসাধ্য কার্য্য সমাপন করিয়া লইতে হইবে। তোমার বিদ্যালয়ের কথা যতই মনে করি ততই মন উৎফুল্ল হয়। অন্ততঃ কয়েকটি জীবন যে তোমার শিক্ষায় অমর হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

এখানে নূতন রকমের কল দেখিয়া ইচ্ছা হয় যে, তোমার স্কুলে ছোট কারখানা খোলা হয়। ছোট কেরসিনের এঞ্জিন ১৫০টাকা মাত্র, অতি সহজেই চলে। বিদ্যুতের আলোর কল তাহা দ্বারা চালান যাইতে পারে, উহার জন্য আর ৫০টাকা। আমার শিষ্য সুরেশের সহিত তোমার স্কুল সম্বন্ধে সর্ব্বদা আলোচনা করি। ছোট American lathe সম্ভবতঃ ২০০টাকার মধ্যে পাওয়া যাইবে। ৫/৬ শত টাকা হইলে তোমার ছোট কারখানা আরম্ভ করা যাইতে পারে।

তোমার জামাতাকে সেদিন নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তাহাকে দেখিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। একমুহূর্ত্তেও তাহার সময় অপব্যয় হয় না, যত অল্প সময়ে সম্ভব তাহাতেই তাহার এখানকার কার্য্য সমাপ্ত হইবে। তুমি হয়ত তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল আছ, এ কয়মাস দেখিতে দেখিতে শেষ হইবে।

রথীর* খবর আমাকে জানাইবে। আমি আগামী বর্ষে হয়ত আমেরিকা যাইতে পারি।

তোমার
জগদীশ

---

* শোকের সময়ে : রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

* রথী : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮–১৯৬১), রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র।

দার্জ্জিলিং
২/৬/১৯১৯

বন্ধু
তুমি ধন্য। *

তোমাব
জগদীশ

---

* জালিওয়ালানাবাগ হত্যাকান্ডেব প্রতিবাদে ববীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালেব ২ জুন নাইট উপাধি ত্যাগ কবাব সংবাদে অভিভূত জগদীশচন্দ্র বসু তিন শব্দেব এই পত্রটি লিখেন।

পরিশিষ্ট-এক

[জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী]

২৪ জুন ১৮৯৯

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
১০ই আষাঢ় ১৩০৬

প্রিয়বরেষু

আপনার পত্রখানি পড়িয়া আমি বিশেষ সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। স্তুতিনিন্দার প্রতি উদাসীন থাকিতে বিশেষ চেষ্টা করি, কৃতকার্য্য হইতে পারি না বলিয়া যথাসম্ভব দূরে থাকি ; কিন্তু সংসারকে ফাঁকি দেওয়া চলে না ; প্রেমদাসের একটা গান আছে :—

বৃথা শোচ কুছ্ কাম ন আওয়ে—
ভোগ বিনা নাহি মিট্‌না।

বৃথা শোক করিয়া কোন ফল হয় না—যাহা ভোগ করিবার তাহা না করিয়া এড়াইবার যো নাই। কিন্তু দুঃখের মধ্যে পরম সুখ এই যে বন্ধুদের সস্নেহ হৃদয় নিজের বেদনার নিকট অগ্রসর হইতে দেখি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়* কুক্ষণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্রি আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি—দশ বারোজন লোক অহর্নিশি তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পাতা আনার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে—লরেন্স্** স্নান-আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীট-সেবায় নিযুক্ত। আমাকে সে দিনের মধ্যে দশবার করিয়া টানাটানি করে—প্রায়

---

* অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : ঐতিহাসিক, তাঁর ইতিহাস চর্চায় রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা পেয়েছিলেন—'ইতিহাস' গ্রন্থে তার প্রভূত নিদর্শন সংকলিত রয়েছে। অক্ষয়কুমার রেশম শিল্পে বিশেষজ্ঞ এবং দেশে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠাকল্পে উদ্যোগী ছিলেন। তিনি রাজশাহী রেশম শিল্প বিদ্যালয়ের একজন প্রধান উদ্যোক্তা। এই বিদ্যালয় থেকে রেশমের কাপড় কিনে রবীন্দ্রনাথ শুধু নিজেই ব্যবহার করতেন না, বন্ধুদেরও উপহার দিতেন।

** লরেন্স : শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের গৃহশিক্ষক। পরে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক ছিলেন।

পাগল করিয়া তুলিল। ইংরেজ জাতি কেন যে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হয় তাহার প্রত্যক্ষ কারণ দেখিতেছি। উহাদের শক্তি চালনা করিবার জন্য বিধাতা উনপঞ্চাশ বায়ু নিযুক্ত করিয়াছেন, অথচ উহাদের মধ্যে বোঝাই এত আছে যে কাৎ করিতে পারে না। এখন যদি আমাদের কীটশালায় একবার আসিতে পারিতেন তবে একটা দৃশ্য দেখিতে পাইতেন। বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। কোন এক সময় ছুটী পাইলে এদিককার কথা স্মরণ করিবেন।

আমার চাষ-বাসের কাজও মন্দ চলিতেছে না। আমেরিকান ভুট্টার বীজ আনাইয়াছিলাম—তাহার গাছগুলো দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিতেছে। মাদ্রাজি সরু ধান রোপন করাইয়াছি, তাহাতেও কোন অংশে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু* সোমবার সস্ত্রীক আমার শস্যক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিবেন।

আপনারা উভয়ে আমাদের আন্তরিক প্রীতি-অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* **দ্বিজেন্দ্রলালবাবু ঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। কবি ও নাট্যকার।**

১৭ সেপ্টেম্বর

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
নদীয়া

প্রিয় বন্ধু,

চুপচাপ বসে একখানা ফরাসী ব্যাকরণ নিয়ে ওল্টাচ্ছিলুম এমন সময় চিঠিখানি পেয়ে মৃত ভেকের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের সঞ্চার হ'য়ে খুব ধড়ফড় ক'রে উঠেছি। লোকেনকে, সুরেনকে আপনার চিঠিখানা দেখাবার জন্যে ছট্‌ফট্ কর্‌চি, কিন্তু তারা দূরে, আজই তাদের লিখে পাঠাতে হবে। যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিন্। কাউকে রেয়াৎ কর্‌বেন না—যে হতভাগ্য surrender না কর্‌বে, লর্ড রবার্টসের মত নির্ম্মম চিত্তে তাদের পুরাতন ঘর-দুয়ার তর্কানলে জ্বালিয়ে দেবেন—আপনি এক সৈন্যসম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সৈন্যসম্প্রদায় গেঁথে যে-রকম ব্যূহ রচনা করেচেন তাতে প্রিটোরিয়ায় ক্রিষ্ট্‌মাস্ করতে পার্‌বেন ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তারপরে আপনি জয় করে এলে আপনার সেই বিজয় গৌরব আমরা বাঙ্গালীরা মিলে ভাগ ক'রে নেব—আপনি কি কর্‌লেন তা বোঝাবার কিছু দরকার হবে না, না বুদ্ধি, না অর্থ, না সময় কিছুই খরচ কর্‌তে হবে না, কেবল টাইম্‌স্ পত্রে ইংরেজের মুখ থেকে বাহবা শোন্‌বামাত্র সেই বাহবা আমরা লুফে নেব। তখন আমাদের দেশীয় কোন বিখ্যাত কাগজে বল্‌বে, আমরা বড় কম লোক নই ; অন্য কাগজে বল্‌বে, আমরা বিজ্ঞানে নব নব তথ্য আবিষ্কার করচি ;— এদিকে আপনার জন্যে কারো সিকি পয়সার মাথাব্যথা নেই, কিন্তু জগৎ থেকে যশের ফসল ঘরে আন্‌বেন তখন আপনি আমাদের ;—চাষের বেলা আপনার একা, লাভের বেলা আমরা সবাই ; অতএব আপনি জয়ী হ'লে আপনার চেয়ে আমাদেরই জিৎ।

আপনি 'ক' বিন্দুতে কম্পমান, আমি 'খ' বিন্দুতে দিব্য নিশ্চেষ্ট নিরুদ্বিগ্ন হ'য়ে বসে আছি—আমার চারিদিকে আমন ধান এবং আখের ক্ষেত আসন্ন শরতের শিশিরাক্ত বাতাসে দোদুল্যমান। শুনে আশ্চর্য্য হবেন, একখানা Sketch book নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আঁক্‌চি। বলা বাহুল্য, সে-ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্যে তৈরী কর্‌চিনে, এবং কোন দেশের

ন্যাশনাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব্ব স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিদ্যাটা ভাল আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম, এবারে ষোল আনা কুঁড়েমিতে মন দেবো তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ কর্‌বার একটা মস্ত বাধা রয়েছে এই যে, যত পেন্সিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশী রবার চালাতে হচ্ছে, সুতরাং ঐ রবার চালানোটাই অধিক অভ্যাস হ'য়ে যাচ্চে—অতএব মৃত র‍্যাফেল্‌ তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'রে থাক্‌তে পারেন—আমার দ্বারা তাঁর যশের কোন লাঘব হবে না।

লোকেন আসন্ন পূজার ছুটিতে আমাকে তার ভ্রমণের সহচর ক'রে সিমলা-শিখরে টান্‌বার জন্যে চেষ্টা কর্‌চে—কিন্তু আমি নড়্‌চিনে। ঋষিরা যখন পর্ব্বত-শিখরে তপস্যা কর্‌তে যেতেন তখন সে এক সময় ছিল—কিন্তু এখন যে গিরিশৃঙ্গে শান্তি নেই সেকথা আপনার অগোচর নেই। আশা করি, দার্জ্জিলিঙের সেই পথে-পাওয়া বন্ধুটিকে ভোলেননি। আমি আমার পদ্মা-তীরের কলহংস-মুখর বালুতটে শারদশ্রীর শুভ শুভ্র সমাগম প্রতীক্ষা কর্‌চি। বোধ করি, মনে আছে, আপনি আমাকে একটি ভ্রমণ-সঙ্গ-দানে প্রতিশ্রুত আছেন, কাশ্মীরে হোক্‌, উড়িষ্যায় হোক্‌, ত্রিবাঙ্কুরে হোক্‌, আপনার সঙ্গে ভ্রমণ ক'রে আপনার জীবনচরিতের একটা অধ্যায়ের মধ্যে ফাঁকি দিয়ে স্থান পেতে ইচ্ছে করি। আশা করি, বঞ্চিত কর্‌বেন না—সেই ভবিষ্যৎ কোন একটা ছুটির জন্যে পাথেয় সঞ্চয় ক'রে রাখ্‌চি। গৃহিণী আমার অনতিদূরে একটা কেদারায় ব'সে আমাকে স্নানাহারের জন্যে অত্যন্ত তাগিদ কর্‌চেন—বেলাও হয়েচে। অতএব ক্ষণকালের জন্যে মার্জ্জনা কর্‌বেন—আমার অধিক দেরী হবে না।

লোকেন আমার যে কাব্য-চয়ন প্রকাশে প্রবৃত্ত ছিল মাঝখানে বিলাতে গিয়ে তার উদ্যম যেন ক'মে এসেছে। সে যদি কিছু না মনে করে তা'হলে আমি নিজেই এ কাজে হাত দিতে পারি। আমি ছবি আঁক্‌চি শুনে যদি আশ্চর্য্য হন ত লোকেন কবিতা লিখ্‌তে ব'সে গেছে শুনে বোধ হয় কম আশ্চর্য্য হবেন না। তার এতই দুরবস্থা হয়েচে ! বেচারাকে শেষকালে কবিতা লেখালে। ওমার খায়েমের বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ কর্‌চে। দুই-একটা নমুনা দেখ্‌লে তার মনের অবস্থা কতকটা বুঝ্‌তে পারবেন :—

মূঢ় তোরা, ত্যজি' সুখ স্বর্গসুখ-আশে
থাকিস্‌ মুক্তির তরে অন্ধ কারাবাসে।
সুদ পাবি ব'লে ফেলে রাখিস্‌ পাওনা,
ছাড়ি না নগদ আমি যাহা হাতে আসে !

এই সমস্ত কবিতায় লোকেন মূলধন ফুঁকে দিয়ে ব্যবসা চালাবার প্রস্পেক্টস্‌ জারি করচে—সুদ চায় না, লাভ চায় না, যা কিছু জমা আছে সব উড়িয়ে দিতে চায়—আমি এ ব্যবসায়ে শেয়ার কিনতে প্রস্তুত নই।

আপনার শ্যালকজায়া আর্য্যা সরলা, বিদ্যার্ণবের কাছে সম্প্রতি সংস্কৃত পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌চেন। শিক্ষা-প্রণালীটি আমার রচিত। খুব দ্রুত উন্নতি লাভ কর্‌চেন—পণ্ডিতমশায় এমন বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়ে ভারী খুসীতে আছেন। আমি তাঁকে পূর্ব্বেই আশ্বাস দিয়েছি আমার

পদ্ধতি মতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তাহ'লে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মাবে। তাঁর সংস্কৃত-চর্চ্চায় আমি ভারি আনন্দিত হয়েচি। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত মেয়েদের অতিমাত্রায় ইংরেজী চর্চ্চার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যে সংস্কৃত শেখাটা একান্ত দরকার হয়েচে।

মশায়, আপনার জন্যে পুরীর জমীটি ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারব ব'লে আশা হচ্চে না, তার প্রতি ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি পড়েচে। কর্ত্তা আমাকে লিখেচেন, পুরী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের আমার ঐ ভূখণ্ডটুকুতে ভারি প্রয়োজন হয়েচে। জোর যার মুল্লুক তার যদি সত্যি হয় তা'হলে ও জমিটুকু রক্ষা হবে না। আপনি যদি এখানে থাক্‌তে থাকতেই বাড়ী আরম্ভ ক'রে দিতে পার্‌তেন তাহ'লে ও লোকটা দাবী কব্‌তে পার্‌ত না।

আজকের দিনটা ঝোড়ো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—মাঝে মাঝে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হ'য়ে যাচ্চে—মাঝে মাঝে বাতাসের দমকা এসে জানলা দরজাগুলো দুদ্দাড় ক'রে দিয়ে যাচ্চে। এই ঝড়-বৃষ্টি-বাদলে বেশ একটি ছুটীর ভাব এনেচে—সেই কর্ম্মপরায়ণ পশ্চিম দেশে এই ভাবটা ঠিক অনুভব কর্‌তে পার্‌বেন না। একে ত সপ্তাহের মধ্যে সাত দিন কাজ করিনে — তার পবে আবার যেদিন একটু বাদ্‌লা হয়, বা শরতের রৌদ্র ওঠে, বা দক্ষিণের হাওয়া বয়, সেদিন আরও বেশী ছুটী নিতে ইচ্চে হয়। আমি ঘরের দরজা খুলে শার্সিগুলো বন্ধ ক'রে ব'সে আচি—ঝর্‌ঝর শব্দে প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়্‌চে।

পত্রোত্তর দানের বিশ্বাস হ'তে যদি নিষ্কৃতি পেতে ইচ্চা করেন তাহ'লে আর্য্যার শরণাপন্ন হবেন—তিনি যদি আপনার হ'য়ে উত্তর দেন তা'হলে আমার কোন নালিশ থাক্‌বে না। তাঁকে আমার সাদর অভিবাদন জানাবেন। আপনি যে কাজে গেছেন তার প্রত্যেক টুকরো খবরটুকু পর্য্যন্ত আমার কাছে পরম উপাদেয়, এটুকু মনে রাখ্‌বেন। কে কি বল্‌চে, কি লিখ্‌চে, কি হচ্চে সমস্ত আদ্যোপান্ত জান্‌বার জন্যে সতৃষ্ণ হ'য়ে আছি। ইতি ১লা আশ্বিন* ।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* পত্রটিতে তারিখ থাকলেও সাল উল্লেখ নেই।

১২ ডিসেম্বর

ওঁ

বন্ধু,

পীড়িত ছিলাম বলিয়া কিছুদিন পত্র বন্ধ ছিল। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয় হইবে ; আমি রঘুপতি সাজিব, সেইজন্য সঙ্গীত সমাজের অনুরোধে পড়িয়া শিলাইদহের বিরহ স্বীকার করিয়া এই পাষাণপুরীর বন্ধনে ধরা দিয়াছি। যত পার তোমার খবর আমাকে পাঠাইবে—তন্ন তন্ন বিবরণের জন্য আমি ক্ষুধাতুর—কোন কথা সামান্য জ্ঞান করিয়া বাদ দিয়ো না। তোমার কীর্ত্তিকাহিনীর মহাভোজের কণাটুকু হইতেও আমি বঞ্চিত হইতে চাই না। ত্রিবেদী তোমার নব প্রকাশিত পুস্তিকা হইতে একটা প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন—এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তাঁহার সহিত একবার দেখা করিব।

আমার গল্পের দ্বিতীয় খণ্ড আর দিন দশেকের মধ্যেই বাহির হইয়া যাইবে। দুইখণ্ড তোমার হস্তগত হইলে নির্ব্বাচন করিবার সুবিধা হইবে। আমার রচনা-লক্ষ্মীকে তুমি জগৎ-সমক্ষে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ—কিন্তু তাহার বাঙ্গলা-ভাষা-বস্ত্রখানি টানিয়া লইলে দ্রৌপদীর মত সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যের ঐ বড় মুস্কিল — ভাষার অন্তঃপুরে আত্মীয়-পরিজনের কাছে সে যে ভাবে প্রকাশমান, বাহিরে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ঐখানে তোমাদের জিৎ—জ্ঞান ভাষার অপেক্ষা তেমন করিয়া রাখে না, ভাব ভাষার কাছে আপাদমস্তক বিকাইয়া আছে।

গবর্ম্মেন্ট যদি তোমাকে ছুটি দিতে সম্মত না হয়, তুমি কি বিনা বেতনে ছুটি লইতে অধিকারী নও? যদি সে-সম্ভাবনা থাকে তবে তোমার সেই ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে পারি। যেমন করিয়া হোক তোমার কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়া আসিও না। তুমি তোমার কর্ম্মের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব।

আমার গল্পের অনুবাদ ছাপাইয়া কিছু যে লাভ হইবে, ইহা আমি আশা করি না—যদি লাভ হয় আমি তাহাতে কোন দাবী রাখিতে চাহি না—তুমি যাহাকে খুসি দিয়ো।

বিসর্জ্জন নাটকের রিহার্সাল আমাকে তাগিদ করিতেছে—অতএব বিদায়। ইতি ১২ই ডিঃ

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

---

* পত্রে তারিখ থাকলেও সন উল্লেখ নেই। চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী ১৯০০ সনের ডিসেম্বরে পত্রটি লেখা।

• গল্পের দ্বিতীয় খণ্ড : গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ড।

২১ মে ১৯০১

ওঁ

শিলাইদহ
২১শে মে
১৯০১

বন্ধু

অনেকদিন থেকে তোমার চিঠির জন্যে প্রত্যাশিত হয়েছিলুম। আজ পেয়ে খুব খুসি হলুম। পাছে তোমার কাজের লেশমাত্র ক্ষতি হয় সেই জন্যে আমি তোমাকে কখন তাগিদ করি নে।

পৃথিবীকে সর্ব্বত্র চিম্‌টি কাটবার যে উপায় তুমি বের করেছ সেইটে পড়ে গর্ব্ব অনুভব করা গেল। এতদিন জড় পদার্থ আমাদের বিধিমতে পীড়ন করে আস্‌ছিলেন এবারে তোমার কল্যাণে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারব। তাদের দেদার চিম্‌টি কাট আর বিষ খাওয়াও—
—ওগুলোকে কোনমতে ছেড়োনা। এখন থেকে আদালতে যদি অপরাধী জড় পদার্থের বিচার হয় তাহলে বিচারক তাদের চিমটি দণ্ড বিধান কর্ত্তে পারবে।

যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাক্‌তে হয় তুমি তারই জন্যে প্রস্তুত হোয়ো, অনর্থক ভারতবর্ষের ঝঞ্চাটের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট কোরো না। তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫/৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে। আমার কাছে লেশমাত্র সঙ্কোচ কোরো না। বৎসরে তোমাকে কত পরিমাণে দিলে তুমি বিনা বেতনে দীর্ঘ ছুটি নিতে পার আমাকে লিখো। যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পার আমি বোধ হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব। তুমি আমাকে খোলসা করে লিখো।

লোকেন যাত্রা করে বেরিয়ে পড়েছে। এতদিনে সে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করেছে। তার প্রতি আমার ঈর্ষ্যা হচ্চে। আমার ভারি ইচ্ছা করচে আমরা জন দুই তিনে মিলে তোমার ওখানে মাছের ঝোল খেয়ে আগুনের কাছে ঘরের কোণে ঘন্টা দুই তিনের জন্যে জমিয়ে বসি। আর একবার আমি লোকেনের সঙ্গে লণ্ডনে গিয়েছিলুম—তখন তোমরা কেউ সেখানে

ছিলেনা—আমি দুদিন থেকেই নিতান্ত ধিক্কার সহকারে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছিলুম। কিন্তু তোমার যদি বিলাতে পাঁচ ছয় বৎসর থাকা হয় তাহলে কি একবার সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে না? আশা করচি দেখা হবে। হয় ত কোন দিন তোমার দরজায় ঠক্‌ঠক্‌ শব্দে ঘা পড়বে।

বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। নানা হাঙ্গামে আমি মন দিতে পারিনি—অনেক ভুলচুক থেকে গেছে। আমার একটা কবিতা এমন বিকৃত হয়ে গেছে তার মানেই বোঝা যায় না। তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলে দেব।

তোমার রবি

৪ জুন*

ওঁ

বন্ধু,

ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং! তোমাদের চিঠি পাইয়া আমি প্রাতঃকাল হইতে নূতন লোকে বিচরণ করিতেছি। যে ঈশ্বর তোমার দ্বারা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন আমি তাঁহার চরণে আমার হৃদয়কে অবনত করিয়া রাখিয়াছি। কোন্ দিক্ দিয়া তিনি আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অদ্য আমি তাহার অরুণাভামণ্ডিত পথ দেখিতেছি। তোমার নিকট পূজা প্রেরণ করিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া আছে—বন্ধু, আমার পূজা গ্রহণ কর! তোমার জয় হউক্। তোমাতে আমাদের দেশ জয়ী হউক্! নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর।

তোমাকে বারম্বার মিনতি করিতেছি—অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর—দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিব।

আমার "মুক্তির উপায়" নামক ছোট গল্পটি তর্জ্জমা করিয়াছে। হিন্দিতে পড়িতে বেশ লাগিল—রস কিছুই নষ্ট হয় নাই।

একটা খবর তোমাদের দেওয়া হয় নাই। হঠাৎ আমার মধ্যম কন্যা রেণুকার বিবাহ হইয়া গেছে। একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব—আমি বলিলাম, কর। যেদিন কথা তার তিন দিন পরেই বিবাহ সমাধা হইয়া গেল। এখন ছেলেটি তাহার অ্যালোপ্যাথি ডিগ্রির উপর হোমিওপ্যাথিক চূড়া চড়াইবার জন্য অ্যামেরিকা রওনা হইতেছে। বেশী দিন সেখানে থাকিতে হইবে না। ছেলেটি ভাল, বিনয়ী, কৃতী।

ভয় নাই—তোমার বন্ধুটিকে তোমার প্রতীক্ষায় রাখিব।

ফস্ করিয়া তাহাকে হস্তান্তর করিব না।

তোমার রবি

---

* জগদীশচন্দ্রের চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুকে মিনতি জানাচ্ছেন গবেষণা বন্ধ করে দেশে ফিরে না আসার জন্যে। জগদীশচন্দ্রের উক্ত পত্র ১৯০১ সনে লেখা। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিতে ৪ জুন উল্লেখ থাকলেও সন উল্লেখ নেই। এই পত্রের সনও ১৯০১ হওয়াই সঙ্গত।

৩ জুলাই ১৯০১

ওঁ

৩রা জুলাই
১৯০১

বন্ধু

আমার কন্যার প্রতি তোমার আশীর্ব্বাদসহ সুন্দর উপহারখানি পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। তোমার হস্তাক্ষরসহ এই গ্রন্থখানি বেলা উপযুক্ত আদর করিয়া পড়িবে ও রাখিবে সন্দেহ নাই। আমার জামাতাটি মনের মত হইয়াছে। সাধারণ বাঙালির ছেলের মত নয়। ঋজুস্বভাব, বিনয়ী অথচ দৃঢ়চরিত্র, পড়াশুনা ও বুদ্ধিচর্চ্চায় অসামান্যতা আছে—আর একটি মহদ্‌গুণ এই দেখিলাম, বেলাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। এইবার শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া গিয়া বেলাকে মজঃফরপুরে তাহার স্বামীগৃহে পৌছাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।

লোকেন বিলাতে গিয়া এমনি মাতিয়া আছে যে, আমাকে কিম্বা বেলাকে একটা ছত্র চিঠিও লিখিল না। তোমার সঙ্গে কি তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে?

আমি সাহসে ভর করিয়া ইলেক্‌ট্রিশ্যান্‌ প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রাবণের বঙ্গদর্শনের জন্য তোমার নব আবিষ্ককার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। প্রথমে জগদানন্দকে লিখিতে যদি পাই, তবু, তুমি তোমার কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছ এই খবর পাইলে আর কিছুই চাই না। তোমার উপরে আমার একান্ত নির্ভর আছে—বর্ত্তমান যুরোপ তোমাকে গ্রহণ করিল কি না তাহা লইয়া আমি অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইতেছি না—তুমি যাহা দেখিতে পাইয়াছ তাহা বৈজ্ঞানিক মায়া-মরীচিকা নহে তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র, দ্বিধামাত্র নাই। তোমার উদ্ভাবিত সত্য একদিন বৈজ্ঞানিক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবে—সেদিনের জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে পারিব।

ইতিমধ্যে তুমি একবার জার্ম্মানি বা আমেরিকায় যাইতে পারিলে বেশ হইত। এবারে না হয় একবার চেষ্টা দেখিতে হইবে।

কন্যাকে ইতিমধ্যে স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিলাম। পথের মধ্যে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া আরাম লাভ করিয়াছি। সেখানে একটা নির্জ্জন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি। দুই একজন ত্যাগ-স্বীকারী ব্রহ্মচারী অধ্যাপকের সন্ধানে ফিরিতেছি।

তোমার রবি

ওঁ

বন্ধু,*

আজ রমেশবাবুর চিঠি পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। তোমার প্রতি, সুতরাং স্বদেশের প্রতি, তাঁহার সহৃদয় অনুরাগে আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। আমার সেই এক কথা। বিলাতে থাকিয়া তোমাকে স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম সমাধা করিতে হইবে। একবার কেবল দুই তিন মাসের জন্য দেশে ফিরিয়া এসো—তোমার সঙ্গে একবার সকল কথা পরিষ্কার রূপে আলোচনা করিয়া লইতে চাই।

তোমার স্পন্দন-রেখার খাতাখানি পাইয়া অনেকটা পরিষ্কার ধারণা হইল। বঙ্গদর্শনে এইগুলি খোদাইয়া ছাপাইবার ইচ্ছা আছে।

তোমার সঙ্গে শীঘ্র দেখা হইবার সম্ভাবনার কল্পনা করিয়া আগ্রহান্বিত হইয়া আছি।

তোমার রবি

---

* পত্রের তারিখ আগস্ট ১৯০১ হতে পারে। ঘটনাক্রম সে রকমই প্রতীয়মান হয়।

২৫ জুলাই

ওঁ

২৫শে জুলাই [১৯০১]

বন্ধু,

তোমার কর্ম্ম কেন সম্পূর্ণ সফল না হইবে? বাধা যতই গুরুতর হউক তুমি যে-ভার গ্রহণ করিয়াছ তাহা সমাধা না করিয়া তোমার নিষ্কৃতি নাই; সেজন্য যে কোন প্রকার ত্যাগ-স্বীকার প্রয়োজন তাহা তোমাকে করিতে হইবে। একথা তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও অসঙ্কোচে বলিতে পারিতাম না। বলিতে পারিতাম না যে, দারিদ্র্য, অর্থসঙ্কট, সাংসারিক অবনতি গ্রহণ কর। আমি নিজে হইলে হয়ত পারিতাম না—কিন্তু তোমাকে আমি নিজের চেয়ে বড় দেখি বলিয়াই তোমার কাছে দাবীর সীমা নাই। তুমি যাহা আবিষ্কার করিতেছ ও করিবে তাহাতে জগতের যে-শিক্ষা লাভ হইবে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে যে-দুঃখভার গ্রহণ করিবে তাহাতে তাহার চেয়ে কম শিক্ষা দিবে না। আমাদের মত বিষয়পরায়ণ সাবধানী, নিষ্ঠাবিহীন, ক্ষুদ্র লোকদের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত, এই শিক্ষা একান্তই আবশ্যক হইয়াছে। ... ... তুমি যদি ফার্লো না পাও তবে একবার এখানে আসিয়ো। যথাসাধ্য ভাল বন্দোবস্ত করিয়া একেবারে যাত্রা করিয়া রণক্ষেত্রে বাহির হইবে। ইহা ছাড়া আর কি পরামর্শ দিতে পারি? একবার দেখা পাইলে বড় আনন্দিত হইব—না করিব। তোমার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাগুণে মহারাজ আমার হৃদয় দ্বিগুণ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেণীর লোকের পক্ষে এরূপ বিনীত গুণগ্রাহিতা অত্যন্ত বিরল।

এখন ত তুমি প্রবাসেই থাকিয়া গেলে। দীর্ঘকাল তোমার বিচ্ছেদ বহন করিতে হইবে। বিলাতে যাইবার লোভ এখন আমার মনে নাই—কিন্তু একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিবার জন্য মন প্রায়ই ব্যগ্র হয়। তোমার সার্ক্যুলর রোডের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি এবং নীচের তলায় মাছের ঝোলের আস্বাদন সর্ব্বদাই মনে পড়ে। এখন যদি ভারতবর্ষে থাকিতে তবে কিছু দিনের জন্যে তোমাকে শান্তিনিকেতনে রাখিয়া নিবিড় আনন্দ লাভ করিতাম। যদি কোন সুযোগ পাই একবার তুমি থাকিতে থাকিতে ইংলণ্ডে যাইবার বিশেষ চেষ্টা করিব। তোমার বন্ধুত্ব যে আমাকে এমন প্রবল ও গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা এক বৎসর পূর্ব্বে জানিতাম না।

তোমার
রবি

ওঁ

আগরতলা
কার্ত্তিক ১৩০৮

বন্ধু

আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েক দিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা ত জানই—সুতরাং তাঁহার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই বোধ হয় দুই এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ করি তুমি বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে আপাতত উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। প্রাসাদ নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে সম্প্রতি মহারাজ জড়িত আছেন নতুবা তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারিতেন। তাঁহার এই উৎসাহে তিনি আমার হৃদয় আরো দৃঢ়তররূপে আকর্ষণ করিয়াছেন—স্বাভাবিক ঔদার্য্যের এমন উজ্জ্বল আদর্শ আমি আর দেখি নাই। তুমি অবসাদ হইতে নিজেকে রক্ষা কর। ফল লাভ করিতে তোমার যতই বিলম্ব হউক আমাদের শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক প্রীতি সর্ব্বদাই ধৈর্য্যসহকারে তোমার পার্শ্বচর হইয়া থাকিবে। তোমাকে আমরা লেশমাত্র তাড়া দিতেছি না ; যাহাতে কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিবার জন্য তুমি যথোচিত বিলম্ব করিতে পার আমরা তাহারই সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি—আমাদের প্রতি সেই আস্থা তুমি দৃঢ় রাখিয়ো। তোমার কাছে আমরা আরো কত দাবী করিব ? তুমি যাহা করিয়াছ তাহার জন্যই যদি আমরা কৃতজ্ঞ না হইতে পারি তবে আমাদিগকে ধিক্। তুমি যাহা করিয়াছ আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিদান কিছুই দিতে পারি না। আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা কতটুকু এবং তাহার মূল্যই বা কি ? এইটুকু দিয়া তোমার উপরে দাবী চালাইতে পারি না। তোমাকে হৃদয়ের গভীর প্রীতি ছাড়া আর কিছুই দিই নাই জানিবে, সে প্রীতি ধৈর্য্য ধরিতে জানে এবং প্রীতি ছাড়া আর কিছুই ফিরিয়া চাহে না। মহারাজের সম্বন্ধে এটুকু নিশ্চয় জানিয়ো তিনি তোমাকে ঋণী করিবার জন্য অর্থসাহায্য করেন নাই তিনি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। যিনি তোমাকে প্রতিভা দান করিয়াছেন তিনিই তোমাকে উদ্যম ও আশা প্রেরণ করিয়া সেই প্রতিভাকে সার্থক করুন !

তোমার
রবি

ওঁ

বন্ধু*

তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই কিন্তু কত দিন যে তোমাকে লইয়া কাটাইয়াছি, হৃদয়ের অন্তরঙ্গ প্রদেশে তোমাকে অনুভব করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আজ তোমার জয় সংবাদ পাইয়া নবমেঘ গর্জ্জনপুলকিত ময়ূরের মত আমার হৃদয় নৃত্য করিতেছে। মাতাল মদের বোতলের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত যেমন পান করে তোমার চিঠির ভিতর হইতে আমি সমস্ত মত্ততাটুকু একেবারে উপুড় করিয়া ধরিয়া চাখিবার চেষ্টা করিতেছি। বহু বিলম্বে তোমার জয় হইলেও আমি হতাশ্বাস হইতাম না—তবু নগদ পাওনার প্রবল আনন্দ।

গতকাল প্যারিসে তোমার বলিবার কথা ছিল—নিশ্চয় সেখানে তোমার জয় হইয়াছে—তোমার সেই বক্তৃতা সভায় আমাদের হৃদয় উপস্থিত ছিল।

য়ূরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিয়ো—তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিয়ো না। গারিবাল্ডি যেমন জয়ী হইয়া রণক্ষেত্র হইতে কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তেমনি তোমাকেও অভ্রভেদী জয়তোরণের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের গভীর নির্জ্জনতার মধ্যে দারিদ্র্যের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে—তখন তোমাকে সকলে খুঁজিয়া লইবে তুমি কাহাকেও খুঁজিবে না—তখন তোমার কাছে আসিতে ভারতবর্ষের কাছে সকলে মাথা নত করিবে—বিদেশী ছাত্রকে ডাকিবার জন্য বিদেশের প্ল্যানে প্রাসাদ রচনা করিলে চলিবে না—মাঠের মধ্যে কুটীরের মধ্যে মৃগচর্ম্মে যে বসিবে সেই তোমাকে পাইবে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কাহারো হাতে দেন নাই—তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি আসিয়া বসিবে—সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমার জয়শব্দ উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পুণ্য সমীরণে এবং নির্ম্মল সূর্য্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত শূন্য প্রান্তর এবং উদার আকাশ তৃষিত বক্ষের ন্যায় ব্যাকুল প্রসারিত বাহুর ন্যায় সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমরাও সেই দিনের জন্য

* পত্রের তারিখ এপ্রিল ১৯০২, ঘটনাক্রম সেরকমই প্রতিয়মান হয়।

তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের রাজা যে কেহ হউক, আমাদের আকাশ, আমাদের দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ কে কাড়িয়া লইবে? আমাদের জ্ঞানের অবকাশ, আমাদের ধ্যানের অবকাশ, আমাদের দারিদ্র্যের অবকাশ হইতে আমাদিগকে কে বঞ্চিত করিতে পারিবে? আমাদের দেশে যে পরমা মুক্তির অচল প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—তাহা স্তব্ধ, তাহা নির্ব্বাক, তাহা দীন, তাহা দিগম্বর, তাহা শাশ্বত—তাহাকে বলীর বাহু ও ক্ষমতাশালীর স্পর্দ্ধা স্পর্শ করিতে পারে না—ইহাই চিত্তের মধ্যে স্থিরনিশ্চয়রূপে জানিয়া শান্তমনে সন্তোষের সহিত প্রসন্নমুখে ইহারই বিরলভূষণ বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। বিদেশীর কটাক্ষে আর ভ্রূক্ষেপ করিব না—তাহার ধিক্কারে আর কর্ণপাত করিব না—তাহার কাছ হইতে যে বর্ব্বর রং চং বসনভূষণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম তাহা তপোবনের দ্বারে আবর্জ্জনার মত ফেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিব।

পত্রের মধ্যে আমাদের আশ্রমবৃক্ষ হইতে কালিদাসের শিরীষ পুষ্প তোমাকে পাঠাইলাম।

তোমার রবি

ওঁ

বন্ধু,*

ঈশ্বর তোমার ললাটে বিজয়-তিলক অঙ্কিত করিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন—তুমি কি আমাদের মত লোকের কাছ হইতে বলের বা উৎসাহের অপেক্ষা রাখ? যেখানে থাক এবং যেমন করিয়াই হউক, উল্লাসে হউক, বাধায় হউক, নৈরাশ্যে হউক, তুমি নিজেকেও ব্যর্থ করিতে পার না। যিনি ভিতরে থাকিয়া তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার সমস্ত জীবনকে সফলতার দিকে লইয়া গেছেন তাঁহার কর্ম্মকে হঠাৎ মাঝখানে নিরর্থক করিবে কে? সীজারের নৌকা কখন ডুবে না। নিরাসক্ত ভারতবর্ষের অবিচলিত স্থৈর্য্য তোমাকে তোমার কর্ম্মের মধ্যে অনায়াসে রক্ষা করুক্। কোন ক্ষুদ্র আকর্ষণ, কোন ইচ্ছার চাঞ্চল্য তোমাকে তোমার মহৎ ব্রত হইতে ভ্রষ্ট না করুক। ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে। তুমি এখানে আসিয়া তপস্বী হইয়া নিভৃতে তোমার শিষ্যদিগকে জ্ঞানের দুর্গম দুর্গের গোপন পথ সন্ধান করিতে শিখাইয়া দিবে, এই আমি আশা করিয়া আছি। পড়া মুখস্থ করানো, পাশ করানো তোমার কাজ নহে— যে-অগ্নি তুমি পাইয়াছ তাহা তুমি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না— তাহা ভারতবর্ষের হৃদয়াগারে স্থায়ী করিয়া যাইতে হইবে; বিদেশী আমাদিগকে জ্ঞানের অগ্নি যেটুকু দেয় তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী ধোঁয়া দিয়া থাকে— তাহাতে যে কেবল আমাদের অন্ধকার বাড়ে তাহা নহে, আমাদের অন্ধতাও বাড়িয়া যায়— আমাদের দৃষ্টি পীড়িত হয়। তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি— আর কোন পথ ভারতবর্ষের পথ নহে— তপস্যার পথ, সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছি, কিন্তু সে-কথা কাহারো মনে নাই — আর একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে— নহিলে মাথা তুলিবার আর কোনো উপায় নাই। ভারতবর্ষের প্রান্তরের বটচ্ছায়ায় সেই বেদী-অধিরোহণে তোমাকে সহায়তা করিতে হইবে। সৈন্য সামন্ত, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, বাণিজ্য, ব্যবসায়, কিছুই আমাকে বিচলিত করে না। আমি মাঠের মাঝখানে বসিয়া সেই প্রাচীন পবিত্র বেদীর স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহা শূন্য রহিয়াছে, আমরা শিশুর মত তাহার মাটি ভাঙিয়া পুতুল গড়িয়া খেলা করিতেছি।

তোমার রবি

---

* মে ১৯০২ চিঠির তারিখ হওয়া যৌক্তিক।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বন্ধু,

তুমি ত তোমার জয়যাত্রায় বেরিয়েছ— "শিবাস্তে পন্থানঃ সন্ত।" আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, তুমি জয়মাল্য বহন ক'রে নিয়ে এসে তোমার দেশকে অলঙ্কৃত কর্‌বে, তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে গেছ। আজ পয়লা বৈশাখ, আজকের নব বর্ষারম্ভের উৎসবে আমি এই প্রার্থনাই কর্‌চি— এতদিন ধ'রে যে সোনার ফসল তুমি ফলিয়ে তুল্‌লে মহাকালের তরণী বোঝাই ক'রে দেশে দেশান্তরে সেই ফসল প্রাণ বিস্তার ক'রে দিক।

যদি সম্ভব হয় এবার একবার আমার বন্ধু রোটেন্‌স্টাইনের সঙ্গে আলাপ ক'রে এসো। তিনি ত খুসি হবেন-ই, তুমিও হবে। আমি তাঁকে, তোমার কথা আগেই লিখে দিয়েছি। তুমিও তোমার পৌঁছা সংবাদ তাঁকে দিয়ো।

বৌঠাকুরাণীকে আমার নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ো।

তোমার রবি

---

* এই পত্রে বোদেনস্টাইনের সঙ্গে আলাপ করে আসার কথা বলা হয়েছে এবং আরো বলা হয়েছে ববীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইনকে জগদীশ চন্দ্রের কথা আগেই লিখেছেন। যে পত্রে তিনি বোদেনস্টাইনকে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন সেই চিঠির তারিখ ১ মার্চ ১৯১৪। সুতরাং এই পত্রটি মার্চ/এপ্রিল ১৯১৪ তারিখে লেখা হয়েছে, এরকমই ধরে নেয়া সঙ্গত।

ওঁ

বন্ধু,

তোমার চিঠি এখানে এসে পেলুম। জাপানে পেলে সুবিধা হ'ত, কেননা সেখানে হাতে কতকটা সময় ছিল। কিন্তু এখানে এসে পৌঁছেই এমন প্রচণ্ড ঘুরপাকের মধ্যে প'ড়ে গেছি যে, কিছুই ভাব্‌বার অবকাশ নেই— কেবলই আমাকে টানাটানি ছেঁড়াছেড়ি ক'রে ঠেলে নিয়ে চলেচে। এখানকার ঝোড়ো বাতাসে এক মুহূর্ত্ত স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার জো নেই— বাড়িতে চিঠিপত্র লেখা পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দিতে হয়েচে। অন্তত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আমাকে এই ঘূর্ণির টানে সহর থেকে সহরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে। যাই হোক, আমি কোনো জায়গায় একটুখানি স্থির হ'য়ে বস্‌বার সময় পেলেই তোমার গান লেখবার সময় করব। তোমার বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাকতে পার্‌তুম তা হ'লে আমার খুব আনন্দ হ'ত। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তা হ'লে তোমার এই বিজ্ঞান-যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে এই কথা মনে রইল। এতদিন যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেচে। কিন্তু এ ত তোমার একলার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে এর বিকাশ হ'তে চল্‌ল। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়— তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী ক'রে দিয়ে যাবে— তারপর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চলতে থাক্‌বে। কতবার আমরা নানা মিথ্যার সঙ্গে জড়িয়ে কত মিথ্যা জিনিষের সৃষ্টি করেচি-- তার উপরে অজস্র টাকা বৃষ্টি ক'রেও তাদের বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারিনি। কেবল মাত্র অভিমান দিয়ে ত কোনো সত্য বস্তু আমরা সৃজন কর্‌তে পারিনে। কিন্তু এ যে তোমার চিরদিনের সত্য সাধনা— এর মধ্যে তুমি যে আপনাকে দিয়েচ, আপনাকে পেয়েচ— তুমি যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত তোমার মন্ত্রকে তোমার অন্তরে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েচ, এইজন্যে বাইরে তাকে প্রকাশ কর্‌বার পূর্ণ অধিকার ঈশ্বর তোমাকে দিয়েচেন। সেই অধিকারের জোরে আজ তুমি একলা দাঁড়িয়ে তোমার মানস-পদ্মের বিজ্ঞান-সরস্বতীকে দেশের হৃদয়-পদ্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত

---

* এই পত্রটি সেপ্টেম্বর/অক্টোবর ১৯১৬ তারিখে লেখা।

করচ। তোমার মন্ত্রের গুণে, তোমার তপস্যার বলে— দেবী সেই আসনে অচলা হবেন, এবং প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে তাঁর ভক্তদের নব নব বর দান কর্‌তে থাক্‌বেন।

দেশে ফের্‌বার জন্যে মন ব্যাকুল হ'য়ে রয়েচে। এখানকার কাজ শেষ হ'তে কতদিন লাগবে জানিনে। কিন্তু এইরকম উর্দ্ধশ্বাসে লাটিমের মত ঘুরে বেড়াতে আর পারিনে।

তোমার রবি

২৮ ডিসেম্বর ১৯২৬

শান্তিনিকেতন

বন্ধু

অবশেষে দেশে এসে পৌঁছলুম। কিন্তু চারিদিকে ক্ষুদ্রতা ও বীভৎসতার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। হঠাৎ একটা perspective থেকে আর একটার ভিতরে এসে নিজে সুদ্ধ যেন খাটো হয়ে পড়ি। বহুদিন পরে দেশে ফিরে আসার আনন্দ যখন ম্লান হয়ে এসেছিল এমন সময়ে আমার নামে উৎসর্গ করা তোমার যে বই* আমার অনুপস্থিতিকালে এখানে এসেছিল সেইটি হাতে আসাতে তখনি বুঝতে পারলুম এইখানেই আমাদের সত্য, এই আলো, এই প্রাণ— এই ভারতের নিত্য পরিচয়। এই বইখানির মধ্যে তোমার বন্ধুত্বের বাণী পেয়ে ভারি আনন্দ হল— মনে যে অবসাদের ছায়া এসেছিল সেটা যেন কেটে গেল। মাঝে মাঝে সত্যের স্পর্শে যখন মায়ার কুয়াশা দূর হয়ে যায় তখন বুঝতে পারি যে আমাদের মনের তন্তুতে তন্তুতে অনেক আদিম অভ্যাস জড়িয়ে আছে— কথায় কথায় জুজু আমাদের পেয়ে বসে— সে যে বস্তুত কিছু না এটা বুঝেও বোঝা শক্ত হয়ে ওঠে।

একেবারে ৭ই পৌষের মুখে এসে পৌঁচেছিলুম। কলকাতায় যে কয়ঘন্টা ছিলুম অবকাশমাত্র ছিল না। তাড়াতাড়ি চলে আসতে হোল— তাই তোমার সঙ্গে সেদিন দেখা করতে পারলুম না। কবে আবার সহরে ফিরব নিশ্চয় জানিনে— কিন্তু গেলেই দেখা হবে।

তোমার আশ্চর্য্য কীর্ত্তির বিবরণ মাঝে মাঝে পেয়েছি— সে কীর্ত্তি আজ সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়েচে। এতে মনে কত আনন্দ ও গৌরব অনুভব করি ব'লে শেষ করতে পারিনে। ইতি ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৬

তোমার রবি

বৌঠাকুরাণীকে আমার সাদর নমস্কার।

---

* উৎসর্গ করা তোমার বই :— 'Nervous Mechanism in Plants' নামের গ্রন্থটি বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছেন জগদীশচন্দ্র। এখানে সেই গ্রন্থের কথাই বলা হয়েচে। উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথা (১৩০৬) এবং খেয়া (১৩১৩) উৎসর্গ করেছেন জগদীশচন্দ্রকে।

পরিশিষ্ট-দুই

রবীন্দ্রনাথকে লেডি অবলা বসু

1, Birch Grove
Acton
London W.
27th March [1902]

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অনেক সময় আপনাকে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু সময়াভাবে সেই ইচ্ছা কার্য্যে পবিণত করিতে পারি নাই।

এখানে আপনার বন্ধুর বিষয়ে যাহা শুনি তাহা আপনাকে অনেক সময় জানাইতে ইচ্ছা হয়। কারণ, আপনি শুনিলে আনন্দিত হইবেন জানি।

এতদিন পরে অধ্যাপক মহাশয়ের সমুদয় শ্রম সার্থক হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। Botanist এবং Biologistরা তাঁহার theory অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেছেন, কেবল Physicistরা এখনও অগ্রসর হন নাই, সেজন্য বোধ হয় France ও Germanyতে যাইতে হইবে। ইংরেজরা এই সকল বিষয়ে অত্যন্ত conservative। আমরা দূর হইতে ইয়োরোপকে সমুদয় সদ্‌গুণের আধার বলিয়া মনে করি, কিন্তু ২/১ বৎসর ইহাদের সঙ্গে থাকিলে অভ্যন্তরের খবর যাহা পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় আমাদের দেশ কোথায় পড়িয়া আছে। এখানে Scientific men-দের মধ্যে যেরূপ intrigue এবং দ্বেষ তাহা শুনিয়া অবাক্ হই। যাক্ সে সব কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই, কেবল অধ্যাপক মহাশয়ের খবর দেওয়াই আমার অভিপ্রায়। আজকাল এখানকার বৈজ্ঞানিক যুবক সম্প্রদায় অধ্যাপক মহাশয়ের theory লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে, সেদিন একজন আমাদের বাড়িতে আসিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের অনুপস্থিতিকালে ২ ঘন্টা পর্য্যন্ত আমার নিকট তাঁহাদের আনন্দ ও উৎসাহ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন যেমন Darwin Biologyকে revolutionize করিয়া দিয়াছেন তেমন Prof. Bose's theory will revolutionize our whole idea of molecular Physics। লোকটি ত একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছেন, বলিলেন if only Prof. Bose will allow us, a dozen of us who thoroughly know our subject, are willing to fight for him.

আজ আর সময় নাই।

নিঃ শ্রী অবলা বসু

পরিশিষ্ট-তিন

রবীন্দ্রনাথের লেখায় জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্র বসু

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি
হে আর্য্য আচার্য্য জগদীশ? কি অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে?
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জনকোলাহলে
যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্ত্তে বিশ্বের কেন্দ্র মাঝে
দাঁড়াইলে একা তুমি— এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্য্যচন্দ্র–পুষ্পপত্র–পশুপক্ষি–ধূলায় প্রস্তরে,—
এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক'পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সঙ্গীতে! মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতিদূর নিষ্ফল গৌরবে,
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পরভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে? সংযত গম্ভীর করি' মন
ছিলে রত তপস্যায় অরূপরশ্মির অন্বেষণে
লোক–লোকান্তের অন্তরালে—যেথা পূর্ব্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড়হাতে!
হে তপস্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জ্জনে
"উত্তিষ্ঠত! নিবোধত!" ডাক শাস্ত্র–অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে। সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে! ডাক দাও তব শিষ্যদলে—
একত্রে দাঁড়াক্ তারা তব হোম–হুতাগ্নি ঘিরিয়া!
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে,— বসুক্ সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে!*

---

* এই কবিতাটি ১৩০৮ আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়েছিল। পরে কবিতাটি 'উৎসর্গ' কাব্যে সংকলিত হয়েছে। কবি মনোমোহন ঘোষ কর্তৃক কবিতাটির একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৮ সনে।

সম্বর্ধনা-সঙ্গীত

জয় তব হোক জয় !
স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে
যশোমালা অক্ষয় !
বহুদিন হতে ভারতের বাণী
আছিল নীরবে অপমান মানি'
তুমি তারে আজি জাগায়ে তুলিয়া
রটালে বিশ্বময়।
জ্ঞানমন্দিরে জ্বালায়েছ তুমি
যে নব আলোকশিখা,
তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে
দিল উজ্জ্বল টীকা।
অবারিতগতি তব জয়রথ
ফিরে যেন আজি সকল জগৎ।
দুঃখ দীনতা যা' আছে মোদের
তোমারে বাঁধি না রয়।**

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে,
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত-শিরে,
পরায়েছ ধীরে।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত-সভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে !
সে ধ্বনি গভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
হ'য়ে সিন্ধুপার।
আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাতঃ !
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে !

৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৪

** ১৯০২ সনের অক্টোবরে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কবেন। 'ভারত সঙ্গীত সমাজ' নামে একটি সংগঠন জগদীশচন্দ্রকে এই উপলক্ষে সংবর্ধনা প্রদান করে ২ ফেব্রুয়ারী ১৯০৩ সনে। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কুচবিহারের মহারাজা। উক্ত অনুষ্ঠানের জন্যে রবীন্দ্রনাথ 'জয় তব হোক জয়' এই গানটি লিখে দিয়েছিলেন।

সত্যরত্ন তুমি দিলে,—পরিবর্ত্তে তার
কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।

শিলাইদহ
অগ্রহায়ণ ১৩০৬*

বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।
কি পেয়েছে আকাশ হতে,
কি এসেছে বায়ুর স্রোতে,
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে
সে যে প্রাণের কথা।

যত্নভরে খুঁজে খুঁজে
তোমায় নিতে হবে বুঝে,
ভেঙ্গে দিতে হবে যে তার
নীরব ব্যাকুলতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, সন্ধ্যা এল, স্বপনভরা
পবন এরে চুমে।
ডালগুলি সব পাতা নিয়ে
জড়িয়ে এল ঘুমে।
ফুলগুলি সব নীল নয়ানে
চুপি চুপি আকাশপানে
তারার দিকে চেয়ে চেয়ে
কোন্ ধেয়ানে রতা!
আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, আনো তোমার তড়িৎ পরশ,
হরষ দিয়ে দাও,—
করুণ চক্ষু মেলে ইহার
মর্ম্মপানে চাও।
সারাদিনের গন্ধগীতি,
সারাদিনের আলোর স্মৃতি
নিয়ে এ যে হৃদয়ভারে
ধরায় অবনতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

---

* 'কথা' কাব্যের উৎসর্গপত্রে বন্ধু জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বন্ধু,

তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
    ক্ষুদ্র তাহা নয় ;—
সত্য যেথা কিছু আছে
    বিশ্ব সেথা রয়।
এই যে মুদে আছে লাজে
পড়বে তুমি এরি মাঝে
জীবন মৃত্যু রৌদ্রছায়া
    ঝটিকার বারতা।

আমার লজ্জাবতী লতা।

কলিকাতা
১৮ আষাঢ় ১৩১৩

'খেয়া'র উৎসর্গপত্র

আচার্য্য জগদীশের জয়বার্ত্তা

নিজের প্রতি শ্রদ্ধা মনের মাংসপেশী। তাহা মনকে উর্দ্ধে খাড়া করিয়া রাখে এবং কর্ম্মের প্রতি চালনা করে। যে জাতি নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে বসে, সে চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়ে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাব ভারতবাসীর পক্ষে গুরুতর অভাব নহে ; কারণ, ভারতবর্ষে রাষ্ট্রতন্ত্র তেমন ব্যাপক ও প্রাণবৎ ছিল না। মুসলমানের আমলে আমরা রাজ্য-ব্যাপারে স্বাধীন ছিলাম না, কিন্তু নিজেদের ধর্ম্মকর্ম্ম, বিদ্যাবুদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবার কোন কারণ ঘটে নাই।

ইংরাজের আমলে আমাদের সেই আত্মশ্রদ্ধার উপরে ঘা লাগিয়াছে। আমরা সুখে আছি, স্বচ্ছন্দে আছি, নিরাপদে আছি ; কিন্তু আমরা সকল বিষয়েই অযোগ্য, এই ধারণা বাহির হইতে ও ভিতর হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। এমন আত্মঘাতিধারণা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।

নিজের প্রতি এই শ্রদ্ধা রক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা লড়াই চলিতেছে। ইহা আত্মরক্ষার লড়াই। আমাদের সমস্তই ভাল, ইহাই আমরা প্রাণপণে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই চেষ্টার মধ্যে যেটুকু সত্য আশ্রয় করিয়াছে, তাহা আমাদের মঙ্গলকর, যেটুকু অন্ধভাবে অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিতেছে, তাহাতে আমাদের ভাল হইবে না। জীর্ণবস্ত্রকে ছিদ্রহীন বলিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য যতক্ষণ চক্ষু বুজিয়া থাকিব, ততক্ষণ শেলাই করিতে বসিলে কাজে লাগে।

আমরা ভাল, একথা রটনা করিবার লোক যথেষ্ট জুটিয়াছে। এখন এমন লোক চাই, যিনি প্রমাণ করিবেন, আমরা বড়। আচার্য্য জগদীশ বসুর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের সেই অভাব পূরণ

করিয়াছেন। আজ আমাদের যথার্থ গৌরব করিবার দিন আসিয়াছে,— লজ্জিত ভারতকে যিনি সেই সুদিন দিয়াছেন, তাঁহাকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত প্রণাম করি।

আমাদের আচার্য্যের জয়বার্ত্তা এখনো ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছে নাই, য়ুরোপেও তাঁহার জয়ধ্বনি সম্পূর্ণ প্রচার হইতে এখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। যে সকল বৃহৎ আবিষ্কারে বিজ্ঞানকে নূতন করিয়া আপন ভিত্তি স্থাপন করিতে বাধ্য করে, তাহা একদিনেই গ্রাহ্য হয় না। প্রথমে চারিদিক্ হইতে যে বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহাকে নিরস্ত করিতে সময় লাগে ; সত্যকেও সুদীর্ঘকাল লড়াই করিয়া আপনার সত্যতা প্রমাণ করিতে হয়।

আমাদের দেশে দর্শন যে পথে গিয়াছিল, য়ুরোপে বিজ্ঞান সেই পথে চলিতেছে। তাহা ঐক্যের পথ। বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত এই ঐক্যের পথে গুরুতর যে কয়েকটি বাঁধা পাইয়াছে, তাহার মধ্যে জড় ও জীবের প্রভেদ একটি। অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় হক্‌স্‌লি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রভেদ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। জীবতত্ত্ব এই প্রভেদের দোহাই দিয়া পদার্থতত্ত্ব হইতে বহুদূরে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে।

আচার্য্য জগদীশ জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আচার্য্যকে কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছিলেন, আপনি ত ধাতব-পদার্থের কণা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতুপদার্থকে চিম্‌টি কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে এমন কোন লক্ষণ বাহির করিতে পারেন, জীব-শরীরে চিম্‌টির সহিত যাহার কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে আমরা বুঝি !

জগদীশবাবু ইহার উত্তর দিবার জন্য এক নূতন কল বাহির করিয়াছেন। জড়বস্তুকে চিম্‌টি কাটিলে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এই কলের সাহায্যে তাহার পরিমাণ স্বত লিখিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের শরীরে চিম্‌টির ফলে যে স্পন্দনরেখা পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই রেখার কোন প্রভেদ নাই।

জীবনের স্পন্দন যে রূপ নাড়ীদ্বারা বোঝা যায়, সেইরূপ জড়েরও জীবনী শক্তির নাড়ীস্পন্দন এই কলে লিখিত হয়। জড়ের উপর বিষ প্রয়োগ করিলে তাহার স্পন্দন কিরূপে বিলুপ্ত হইয়া আসে, এই কলের দ্বারা তাহা চিত্রিত হইয়াছে।

বিগত ১০ই মে তারিখে আচার্য্য জগদীশ রয়াল ইন্‌ষ্টিট্যুশনে বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড়পদার্থের সাড়া (The response of in-organic matter to mechanical and electrical stimulus)। এই সভায় ঘটনাক্রমে লর্ড রেলি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু প্রিন্স ক্রপট্‌কিন্ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রতিষ্ঠাবান্ লোকেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় উপস্থিত কোন বিদূষী ইংরাজ মহিলা, সভার যে বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, নিম্নে তাহা হইতে স্থানে স্থানে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

সন্ধ্যা নয়টা বাজিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং বসু-জায়াকে লইয়া সভাপতি সভায় প্রবেশ করিলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অধ্যাপকপত্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তিনি অবগুণ্ঠনাবৃতা এবং শাড়ী ও ভারতবর্ষীয় অলঙ্কারে সুশোভনা। তাঁহাদের পশ্চাতে যশস্বী লোকের দল, এবং সর্বপশ্চাতে আচার্য্য বসু নিজে। তিনি শান্ত নেত্রে একবার সমস্ত সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অতি স্বচ্ছন্দ সমাহিত ভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার পশ্চাতে রেখাঙ্কন–চিত্রিত বড় বড় পট টাঙান রহিয়াছে। তাহাতে বিষপ্রয়োগে, শ্রান্তির অবস্থায়, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি আক্ষেপে, উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্নায়ু ও পেশীর এবং তাহার সহিত তুলনীয় ধাতুপদার্থের স্পন্দনরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার সম্মুখে টেবিলে যন্ত্রোপকরণ সজ্জিত।

তুমি জান, আচার্য্য বসু বাগ্মী নহেন। বাক্যরচনা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য নহে ; এবং তাঁহার বলিবার ধরণও আবেগে ও সাধ্বসে পূর্ণ। কিন্তু সে রাত্রে তাঁহার বাক্যের বাধা কোথায় অন্তর্ধান করিল। এত সহজে তাঁহাকে বলিতে আমি শুনি নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার পদবিন্যাস গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল,—এবং মাঝে মাঝে তিনি সহাস্যে সুনিপুণ পরিহাস–সহকারে অত্যন্ত উজ্জ্বল সরলভাবে বৈজ্ঞানিকব্যূহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা প্রশাখার ভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন।

তাহার পরে, বিজ্ঞানশাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে সকল ভেদনিরূপক–সংজ্ঞা ছিল, তাহা তিনি মাকড়সার জালের মত ঝাড়িয়া ফেলিলেন। যাহার মৃত্যু সম্ভব, তাহাকেই ত জীবিত বলে ;—অধ্যাপক বসু একখণ্ড টিনের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া আমাদিগকে তাহার মরণাক্ষেপ দেখাইতে প্রস্তুত আছেন, এবং বিষপ্রয়োগে যখন তাহার অন্তিম দশা উপস্থিত, তখন ঔষধ প্রয়োগে পুনশ্চ তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন।

অবশেষে অধ্যাপক যখন তাঁহার স্বনির্মিত কৃত্রিম চক্ষু সভার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং দেখাইলেন, আমাদের চক্ষু অপেক্ষা তাহার শক্তি অধিক, তখন সকলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ ঐক্য অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্যসংবাদ আধুনিক কালের ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কিরূপ পুলক সঞ্চার হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল, যেন বক্তা নিজের নিজত্ব–আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন,— কেবল তাঁহার দেশ এবং তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে উত্থিত হইল,— এবং বক্তার নিম্নলিখিত উপসংহারভাগ যেন সেই তাহারই উক্তি !

I have shown you this evening the autographic records of the history of stress and strain in both the living and non-living. How similar are the two sets of writings, so similar indeed that you cannot tell them one from the other ! They show you the waxing and waning pulsations of life—the climax due to stimulants, the gradual decline of fatigue, the rapid setting in of death-rigor from the toxic effect of poison.

It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that binds together all things—the mote that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns that shine on it—it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago—

"They who behold the One, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else."

বৈজ্ঞানিকদের মনে উৎসাহ ও সমাজের অগ্রণীদের মধ্যে শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সভাস্থ দুই একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ধীরে ধীরে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার উচ্চারিত বচনের জন্য ভক্তি ও বিস্ময় স্বীকার করিলেন।

আমরা অনুভব করিলাম যে, এতদিন পরে ভারতবর্ষ— শিষ্যভাবেও নহে, সমকক্ষভাবেও নহে, গুরুভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভায় উত্থিত হইয়া আপনার জ্ঞানশ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল,— পদার্থতত্ত্ব-সন্ধানী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিল।

লেখিকার পত্র হইতে সভার বিবরণ যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অহঙ্কার বোধ করি নাই। আমরা উপনিষদের দেবতাকে নমস্কার করিলাম ; ভারতবর্ষের যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্ব প্রাণ এজতি" এই যাহা কিছু সমস্ত জগৎ প্রাণেই কম্পিত হইতেছে, সেই ঋষিমগুলীকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বলিলাম, হে জগদ্‌গুরুগণ, তোমাদের বাণী এখনও নিঃশেষিত হয় নাই, তোমাদের ভস্মাচ্ছন্ন হোমহুতাশন এখনো অনির্ব্বাণ রহিয়াছে, এখনো তোমরা ভারতবর্ষের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছ! তোমরা আমাদিগকে ধ্বংস হইতে দিবে না, আমাদিগকে কৃতার্থতার পথে লইয়া যাইবে। তোমাদের মহত্ত্ব আমরা যেন যথার্থভাবে বুঝিতে পারি। সে মহত্ত্ব অতিক্ষুদ্র আচার বিচারের তুচ্ছ সীমার মধ্যে বদ্ধ নহে,— আমরা অদ্য যাহাকে "হিঁদুয়ানি" বলি, তোমরা তাহা লইয়া তপোবনে বসিয়া কলহ করিতে না, সে সমস্তই পতিত ভারতবর্ষের আবর্জ্জনামাত্র ;— তোমরা যে অনন্তবিস্তৃত লোকে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, সেই লোকে যদি আমরা চিত্তকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারি, তবে আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে প্রতিহত না হইয়া বিশ্বরহস্যের অন্তরনিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিবে। তোমাদিগকে স্মরণ করিয়া যতক্ষণ আমাদের বিনয় না জন্মিয়া গর্ব্বের উদয় হয়, কর্ম্মের চেষ্টা জাগ্রত না হইয়া সন্তোষের জড়ত্ব পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, এবং ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের উদ্যম ধাবিত না হইয়া অতীতের মধ্যে সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া লোপ পায়, ততক্ষণ আমাদের মুক্তি নাই।

আচার্য্য জগদীশ আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানরাজ্যে যে পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সে পথ প্রাচীন ঋষিদিগের পথ— তাহা একের পথ। কি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, কি ধর্ম্মে-কর্ম্মে, সেই পথ ব্যতীত "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

কিন্তু আচার্য্য জগদীশ যে কর্ম্মে হাত দিয়াছেন, তাহা শেষ করিতে তাঁহার বিলম্ব আছে। বাধাও বিস্তর। প্রথমত, আচার্য্যের নূতন সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষার দ্বারা অনেকগুলি পেটেন্ট্ অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে এবং একদল বণিক্‌সম্প্রদায় তাঁহার প্রতিকূল হইবে। দ্বিতীয়ত, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবনকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ব্যাপার বলিয়া জানেন, তাঁহাদের বিজ্ঞান যে কেবলমাত্র পদার্থতত্ত্ব, একথা তাঁহারা কোনমতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। তৃতীয়ত, কোন কোন মূঢ় লোকে মনে করেন যে, বিজ্ঞান দ্বারা জীবনতত্ত্ব বাহির হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন থাকে না, তাঁহারা পুলকিত হইয়াছেন। তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া খৃষ্টান্ বৈজ্ঞানিকেরা তটস্থ, এজন্য অধ্যাপক কোন কোন বৈজ্ঞানিকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং একাকী তাঁহাকে অনেক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

তবে, যাঁহারা নিরপেক্ষ বিচারের অধিকারী, তাঁহারা উল্লসিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এমন ঘটনা হইয়াছে যে, যে সিদ্ধান্তকে রয়াল সোসাইটি প্রথমে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিহার করিয়াছিলেন, বিশ বৎসর পরে পুনরায় তাঁহারা আদরের সহিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশ যে মহৎ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক-সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার পরিণাম বহুদূরগামী। এক্ষণে আচার্য্যকে এই তত্ত্ব লইয়া সাহস ও নির্বন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাকে সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিযা তবে তিনি বিশ্রাম করিতে পাইবেন। এ কাজ যিনি আরম্ভ করিয়াছেন, শেষ করা তাঁহারই সাধ্যায়ত্ত। ইহার ভার আর কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না। আচার্য্য জগদীশ বর্ত্তমান অবস্থায় যদি ইহাকে অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, তবে ইহা নষ্ট হইবে।

কিন্তু তাঁহার ছুটি ফুরাইয়া আসিল। শীঘ্রই তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনাকার্য্যে যোগ দিতে আসিতে হইবে এবং তিনি তাঁহার অন্য কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন।

কেবল অবসরের অভাবকে তেমন ভয় করি না। এখানে সর্বপ্রকার আনুকূল্যের অভাব। আচার্য্য জগদীশ কি করিতেছেন, আমরা তাহা ঠিক বুঝিতেও পারি না। এবং দুর্গতিপ্রাপ্ত জাতির স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতাবশত আমরা বড়কে বড় বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারি না, শ্রদ্ধা করিতে চাহি-ও না। আমাদের শিক্ষা, সামর্থ্য, অধিকার যেমনই থাক, আমাদের স্পর্দ্ধার অন্ত নাই। ঈশ্বর যে সকল মহাত্মাকে এ দেশে কাজ করিতে পাঠান, তাহারা যেন বাংলা গবর্মেন্টের নোয়াখালি-জেলায় কার্য্যভার প্রাপ্ত হয়। সাহায্য নাই, শ্রদ্ধা নাই, প্রীতি নাই,— চিত্তের সঙ্গ নাই, স্বাস্থ্য নাই, জনশূন্য মরুভূমিও ইহা অপেক্ষা কাজের পক্ষে অনুকূল স্থান ;– – এই ত স্বদেশের লোক— এদেশীয় ইংরাজের কথা কিছু বলিতে চাহি না। এ ছাড়া যন্ত্র-গ্রন্থ, সর্ব্বদা বিজ্ঞানের আলোচনা ও পরীক্ষা ভারতবর্ষে সুলভ নহে।

আমরা অধ্যাপক বসুকে অনুনয় করিতেছি, তিনি যেন তাঁহার কর্ম্ম সমাধা কবিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন ! আমাদের অপেক্ষা গুরুতর অনুনয় তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে, তাহা আমরা জানি। সে অনুনয় সমস্ত ক্ষতি ও আত্মীয় বিচ্ছেদ দুঃখ হইতেও বড়। তিনি সম্প্রতি নিঃস্বার্থ জ্ঞানপ্রচারের জন্য তাঁহার দ্বারে আগত প্রচুর ঐশ্বর্য্য-প্রলোভনকে অবজ্ঞাসহকারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সে সংবাদ আমরা অবগত হইয়াছি, কিন্তু সে সংবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার, আমাদের আছে না আছে, দ্বিধা করিয়া আমরা মৌন রহিলাম। অতএব এই প্রলোভনহীন পণ্ডিত জ্ঞানস্পৃহাকেই সর্ব্বোচ্চে রাখিয়া জ্ঞানে, সাধনায়, কর্ম্মে, এই হতচারিত্র হতভাগ্য দেশের গুরু ও আদর্শস্থানীয় হইবেন, ইহাই আমরা একান্ত মনে কামনা করি।

* ১৩০৮ সালের আষাঢ় সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সময় বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করছিলেন। এই প্রবন্ধটি যখন প্রকাশিত হয়, জগদীশচন্দ্র তখন বিলাতের সুধী মহলকে নিজেব আবিষ্কাব দ্বাবা মোহিত, অভিভূত করে তুলছিলেন।

JAGADISH CHANDRA BOSE

Years ago, when Jagadis Chandra, in his militant exuberance of youthfulness, was contemptuously defying all obstacles to the progress of his endeavour, I came into intimate contact with him, and became infected with his vigorous hopefulness. There was every chance of his frightening me away into a respectful distance, making me aware of the airy nothingness of my own imaginings. But to my relief, I found in him a dreamer, and it seemed to me, what surely was a half-truth, that it was more his magical instinct than the probing of his reason which startled out secrets of nature before sudden flashes of his imagination. In this I felt our mutual affinity but at the same time our difference, for to my mind he appeared to be the poet of the world of facts that waited to be proved by the scientist for their final triumph, whereas my own world of visions had their value, not in their absolute probability, but in their significance of delightfulness. All the same, I believe that a part of my nature is logical which not only enjoys making playthings of facts, but seeks pleasure in an analytical view of objective reality. I remember often having been assured by my friend that I only lacked the opportunity of training to be a scientist but not the temperament. Thus in the prime of my yuoth I was strangely attracted by the personality of this remarkable man and found his mind sensitively alert in the poetical atmosphere of enjoyment which belonged to me.

At this time he was busy detecting in the behaviour of the non-living some hidden impulses of life. This aroused a keen enthusiasm in me who had ever been familiar with the utterance of the Upanishad which proclaims that whatever there is in this moving world vibrates with life. Afterwards he shifted his enquiries from the field of physics to the biological realm of plants. With the marvellously sensitive instruments which he invented he magnified the inaudible whisperings of vegetable life, which seemed to him somewhat similar in language to the message of our own nerves. My mind was overcome with joy at the idea of the unity of the heart-beats of the universe, and I felt sure that the pulsating light which palpitates in the stars has its electric kinship in the life that throbs in my own veins. I knew that this was not science, but my mind trembled with the hope that opening message had already been declared and final evidences were in preparation.

At last when Jagadis Chandra sailed across the sea to place the results of his researches before the questioning scrutiny of the West, my heart expanded with an undoubting expectation of our country's claim to a world-recognition being accepted and at the prospect of a wide establishment of a wonderful truth which is native to our oriental attitude of mind. With what little lay in my power I helped him in his adventure but, fortunately, since then no more help was needed either in companionship or in other ways from a man like me who was too heavily burdened with his own responsibilities. His fame spread rapidly and material contributions from all sides showered uopon his schemes, which centralized at last in the Bose Institute. I fervently hope that Spirit of Science will find its lasting shrine in this place and the aspiration of the great master will remain a living force in its heart, making it a perpetuel memorial worthy of him.

This tribute of mine to the memory of Jagadis will appear inadequately feeble, especially in contrast to the repeated magnification of his name in my writings both in prose and verse at the time when his fame was not luminously apparent above the horizon and when. I am sure, my fellowship and unfaltering faith in his genius did hearten and help him. But my struggling health, which has lately been wrenched back from the grip of death, is incompetent for most of my important tasks and also the singing hope that began its first soaring in immensity has completed its journey in its terminus.

* এই প্রবন্ধটি বিশ্বভাবতীব কোযার্টার্লি পত্রিকায ১৯৩৮ সনেব নভেম্ববে প্রকাশিত হযেছিল।

JAGADISH CHANDRA BOSE
Memorial Address

When by some fortunate chance I came into an intimate contact with Sir Jagadish, he was in the prime of his youth and I was very nearly of his age. At that moment his mind seemed entranced with a vision of the living creatures' fundamental kinship with the world of the unconscious. He was busy in employing his marvellous inventiveness in coaxing mute Nature to yield her hidden language. The response which he received through skilful questionings revealed to him glimpses of the mystery of an existence that concealed its meaning underneath a contradiction of its appearance. I had the rare privilege of sharing the daily delight of his constant surprises. I believe, poets inherit the primeval age in their temperament when things in their infant simplicity revealed a common feature. Somehow these lovers of Maya feel the joy of their being spread all over the creation, which makes them indulge in seeking the analogy of the living in things that appear lifeless. Such an attitude of mind may not in all cases be based upon any, definite belief, animistic or pantheistic ; it may be merely a make-believe, as we notice in children's play, which owes its origin to the lurking tendency in our sub-conscious mind to ascribe life-energy to all activities in the natural world. I was made familiar from my boyhood with the Upanishad which, in its primitive intuition, proclaims that whatever there is in this world vibrates with life, the life that is one in the infinite.

This might have been the reason of the eager enthusiasm with which I expected that the idea of the boundless community of life in the world was on the verge of a final sanction from the logic of scientific verification. Being allowd to follow the Master's footsteps in the privacy of his pursuit, even though as a mere picker of his casual hints, I had my daily feast of wonders. At this early stage of his adventure when obstacles were powerfully numerous and jealousy largely predominated over appreciation, friendly companionship and sympathy must have had some needful value for him

even from one who to maintain intellectual communion with him lacked special competency. Yet I can proudly claim to have helped him in some of his immediate needs and occasional hours of despondency in those days of an inadequate recognition and feeble support that he received from the public.

In the background of that distant memory of mine, I find not the slightest gleam of a vision of the enormous success that could before long combine scientific renown with a vast material means adequate enough to build this Institute, one of the very few richly endowed mediums in India for bestowing the benediction of science upon his countrymen. In fact, it makes me laugh at myself to-day to read, in some of my old letters, my effort to encourage him with the likelihood of filling the gaps in his funds when my own resources were precariously limited to persuading friends who were foolish enough to have faith in me. Still it is comically sweet to think the proud magnificence in my assurance fitfully accompanied by contribution absurdly poor compared to the ceaseless flow of tribute that, later on, he could attract by his own magnetic personality and also by the general confidence he widely aroused in his genius. But I repeat again, it was sweet to have dreamed impracticable dreams and to have done however little it was possible, as it proves a courage of joy in the faith in greatness which itself is a bounteous gift to one's own mind.

However ill-equipped as I was by the deficiency in my training and by the poet's idiosyncrasy to be a fit companion to a man of science at a luminous period of his self-revelation, I was still accepted as his close friend and, possibly because of the contrariety in our natural vocations, I was able to offer some stimulation to his urge of fulfilment. Not having the necessary amount of vanity in my constitution, it had been the subject of constant wonder in my mind.

Since then time passed quickly, maturing the fruits of our expectation. During this period of his fast-growing triumph, I was modest enough to feel less and less the urgency of my comradeship in his journey towards the goal, which was no longer arduous or beset with uncertainty. And yet I can rightfully claim the credit for strengthening in some measure his trust in his own destiny, by adding to it my own unwavering faith, at that painfully hesitant moment of fortune during the dubious dawn of his cerrer, when even persons of meagre resources might have some important use.

Victory is the inalienable claim of all genuine power having the might of attraction that naturally exploits all kindred elements on its path and moulds them into an image of glory. And such an image is this Institute, which represents the Master's lifelong endeavour taking a permanent shape in the form of a centre for the inspiration of similar endeavours.

However, the early association of mine with the Master's first great challenge of genius to his fate, whose path at that time did not run smooth, belongs for me to a remote period of a history in which I feel myself hazily indistinct. And this made me sereiously waver to accept the invitation for taking an honoured seat at a ceremonial meeting in this institution. The presumptuousness of youth made me absurdly proud to imagine that my

companionship was growing into an organic part in the history that was being evolved before my eyes, and in that belief I did try to hearten the hero, which was a part of my vanity. But foolish youth does not last for ever, and I have had time to come to realise my limitation. Anyhow it is quite obvious, that I am a mere poet carrying on my sadhana in the temple of language, the most capricious deity who is apt to ignore her responsibility to logic, often losing herself in the nebulous region of fantasy. Our oriental custom is to bring proper gifts to sacred shrines, but my gift of words for this occasion cannot but be out of place among the records of memorable proceedings of a learned society.

Fortunately there are some few men among us who can claim fellowship with the aristocracy in the realm of science, and can be expected to make splendid this ceremony with the wealth of theif thoughts. I can only bless this institution from that obscure distance where the multitude of the uncared-for generations of this country have helplessy drifted to the pitiless toil of primitive land-tilling. I offer my salutation to the illustrious founder of this Institute, humbly sitting by those who are deprived of a sufficiency of that knowledge which only can save them from the desolating menace of scientific devilry and from the continual drainage of the resources of life, and I appeal to this Institute to bring our call to science herself to rescue the world from the clutches of the marauders who betray her noble mission into an unmitigated savagery.*

* রবীন্দ্রনাথেব এই বক্তৃতাটি ১৯৩৮ সনেব ডিসেম্ববে 'মডার্ন বিভিউ' পত্রিকায মুদ্রিত হযেছিল।

...আজ জগদীশ বসুর এক চিঠি পেয়ে ভারি আনন্দে আছি। এবারে তিনি সেখানে খুব বড় রকমের জয়লাভ করে আসবেন তার সূত্রপাত হয়েছে। এবারে তিনি যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করেচেন তাতে বিজ্ঞানের অনেকগুলি প্রাচীন মত উল্টে গিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক বিপ্লব উপস্থিত হবে— একবারে মূলতত্ত্বে ঘা দেবে— কেবল Physics নয়, কেমিষ্ট্রি, ফিজিয়লজি এমন কি Psychology পর্য্যন্তে আঘাত করবে। যুদ্ধ ত আরম্ভ হয়েছে। ইলেক্‌ট্রিসিটি সম্বন্ধে Prof. Lodge য়ুরোপের মধ্যে একজন মহারথী— জগদীশ বসুর মত বিশেষ রূপে তাঁরই মত খণ্ডন করেছে। সে জন্যে প্রথমে, প্রোফেসার যুদ্ধসাজে সদলবলে এসেছিলেন— কিন্তু জগদীশ বসুর প্রবন্ধ শুনে Prof. Lodge উঠে প্রশংসাবাদ করে বসুজায়ার নিকট গিয়ে বল্লেন— Let me heartily congratulate you on your husband's splendid work. তার পরে তাঁরা ওঁকে ধরে পড়েছেন যে, তুমি ইংলণ্ডে থেকে কাজ কর, ভারতবর্ষে তোমার বিস্তর ব্যাঘাত। ওঁকে সেখানকার একটা বড় য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করবার জন্যে তাঁরা অনুরোধ করচেন— তিনি জন্মভূমির প্রতি মমত্ববশতঃ ইতস্ততঃ করচেন। আমি তাঁকে মিনতি করে লিখেছি যে, জন্মভূমির মোহ যেন তাঁর চিত্তকে তাঁর কাজের সফলতা থেকে বিক্ষিপ্ত করে না দেয়। সেখানে অবসর এবং

বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সহায়তা ও সহানুভূতির মধ্যে না থাকলে তাঁর হাতের সুবৃহৎ কাজ সমাধা করতে পারবেন না। তাঁর কৃতকার্য্যতাতেই তাঁর মাতৃভূমির গৌরব। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রাণমনে প্রার্থনা করি তাঁর জয় হোক!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই পত্রটি ১৩৫০ বৈশাখ সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

অনেকদিন পরে মহারাজের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

মহারাজের সহিত আমি এমন কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না যাহাতে লোকে স্বার্থসিদ্ধির অপবাদ দিতে পারে। আমার সাধ্য সৎসামান্য হইলেও, এবং উদ্দেশ্য লোকহিতকর হইলেও, যে কাজ নিজের হাতে লইয়াছি সে সম্বন্ধে মহারাজের নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা লইব না ইহা আমি স্থির করিয়াছি। কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন মহৎ কর্ম্মের মূল্য থাকে না— আমার যতদূর সাধ্য আছে বঙ্গদর্শন পরিচালনায় তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই গৌরব লাভ করিব। এবারে জগদীশবাবুর পত্র পড়িয়া এই বিষয়ে আমি মনে মনে বল লাভ করিয়াছি— জগদীশবাবুর প্রতিভায় পাণ্ডিত্য এবং সহৃদয়তার আশ্চর্য্য মিলন হইয়াছে বলিয়া এ সকল ব্যাপারে তাঁহার মত আমার কাছে সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনি লিখিয়াছেন :

'তুমি পুনরায় সম্পাদকের ভার লইয়া তোমার সময় নষ্ট করিবে মনে করিয়া প্রথম প্রথম দুঃখিত হইয়াছিলাম। তারপর দুই সংখ্যা বঙ্গদর্শন পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আর, সমস্ত লেখাতে একটি নূতন ভাব দেখিয়া অতিশয় আশান্বিত হইয়াছি। এতদিন পরে যদি আমাদের চক্ষের আবরণ ঘুচিয়া যায় এবং আমরা আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারি, তাহা অপেক্ষা আর কিছুই অভিপ্রেত হইতে পারে না। তোমার আকাঙ্ক্ষা যেন ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়। আর, তুমি যে সব দুরূহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা যেন রক্ষা করিতে সমর্থ হও! আমার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভ এই যে, আমাদের প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া ভুলিয়া আছি। এখন এ সব দেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছি, এখন অনেক বুঝিতে পারি। অন্য কোন দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্নস্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে? অন্য কোন জাতি অনার্য্যকে আর্য্য করিতে পারিয়াছে? অন্য কোথায় নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পুণ্য এরূপ প্রসারিত হইয়াছে? তবে আজকাল জ্ঞান লইয়া সভ্যাসভ্যের বিচার হয়। তোমরা মূর্খ তোমরা কেবল নকল করিতে পার ইত্যাদি কথা বিদেশী কেন, স্বদেশীয় অনেকের নিকট শুনিয়াছি। এই এক কথা শুনিয়া সমস্ত দেশের লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আছে। তুমি স্নেহগুণে আমার অনেক অযথা প্রশংসা করিয়াছ। যদি কিছু প্রশংসার থাকে তবে এই যে আমি এই মন্ত্রপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত

করিতে পারিয়াছি। আমি সত্য বলিতেছি যে, অন্যে যাহা করিয়াছে তাহা যতই উচ্চ হউক না কেন তাহা আমাদের জাতির পক্ষে অসম্ভব নহে। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন সেই Eternal lie, যাহা দ্বারা আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উৎসাহ, নির্ম্মূল হইয়াছে— সেই ঘোর মিথ্যাপাশকে চিরকালের জন্য ছিন্ন করিতে পারি।"

জগদীশবাবুর এই পত্র আমার পক্ষে পারিতোষিক। আমি যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। হিন্দুর যথার্থ গৌরব কি, এবং হিন্দুর উন্নতিসাধনের প্রকৃত পথ কোন্ দিকে বঙ্গদর্শনে তাহাই সম্যক আলোচিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব। হিন্দুত্ব কি তাহাই আমি ক্রমশঃ দেখাইতেছি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাইতেছি যে, যুরোপীয় সভ্যতায় যাহাকে ন্যাশনাল মহত্ব বলে তাহাই মহত্ত্বের একমাত্র আদর্শ নহে। আমাদের বিপুল সামাজিক আদর্শ তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ও উচ্চ ছিল। এই আদর্শকে যদি জড়ত্ববশত আমরা নষ্ট হইতে দিই তবে যুরোপীয় মতে নেশন্‌ও হইব না অথচ আত্মপ্রকৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল হইব।

জগদীশবাবুর জন্য কিছু করিবার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহারাজ আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি— আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনাদোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া না থাকিতাম তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না, আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। দুরবস্থায় পড়িয়া আমার সর্ব্বপ্রধান আক্ষেপ এই যে দেশের হিতকার্য্যের জন্য পরকে উত্তেজনা করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। মহারাজের উদার হৃদয়, লোকহিতৈষা মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক, সেই গুণে আমি মহারাজের নিকট একান্ত আকৃষ্ট হইয়া আছি। জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক— এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তুত। ... আমি মাহারাজের নির্জ্জন খাস্ দরবারের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রত্যাশী—আমি মহারাজের প্রতি নিতান্তই উপদ্রব করিব, মন্ত্রীবর্গদ্বারা আমি প্রতিহত হইব না। মহারাজার পরিচরবর্গ নানা কথাই বলিবে, নানা অভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া আমাকে সঙ্কুচিত করিবে, কিন্তু আমি তাহা শিরোধার্য্য করিব। মহারাজার নিকট পূর্ব্ব হইতেই আমার এই নিবেদন রহিল। মহারাজের প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই আমি অকুণ্ঠিতভাবে সকল কথা বলিলাম। যদি ধৃষ্টতা হইয়া থাকে তবে মার্জ্জনা করিবেন। এবং আমাকে ব্যক্তিগত হিসাবে মার্জ্জনা করিয়া আমার একান্ত আন্তরিক মঙ্গল উদ্দেশ্যের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি রক্ষা করিবেন। ...ইতি ২৪শে শ্রাবণ ১৩০৮

চিরানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* মহারাজ রাধাকিশোর মানিক্য বাহাদুরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি ১৩৪৯ আশ্বিন সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

... জগদীশকে মহারাজ যে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন তাহার জন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত হইয়াছে। মহারাজের উদার মহত্ত্ব বারম্বার অনুভব করিয়াছি, তাহা চিরকাল মনে রহিবে, মুখে প্রকাশ করিব কি করিয়া? ... মহারাজের ঔদার্য্য কালক্রমে সর্ব্বপ্রকার বাধামুক্ত হইয়া আমাদের স্বদেশকে সফলতার পথে প্রতিষ্ঠিত করিবে। ... ইতি ২৪শে শ্রাবণ ১৩০৯

অনুরক্ত ভক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* এই পত্রটিও মহারাজ রাধাকিসোর মানিক্যকে লেখা। ১৩৫৯ শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

মহারাজের নিকট অধ্যাপক বসুর একটি প্রার্থনা জানাইবার নিমিত্ত এই পত্র লিখিতেছি।

অধ্যাপক মহাশয় উদ্ভিদের বর্দ্ধন পরিমাপের জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এই বর্দ্ধনতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন।

ত্রিপুরায় যে মুলী বাঁশ জন্মে— শিশু অবস্থায় তাহার বৃদ্ধি অতিশয় দ্রুত। এই গাছের চারা তাঁহার পরীক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক হইয়াছে। সদ্য অঙ্কুরিত মুলী বাঁশের চারা মহারাজ যদি সত্বর তাঁহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিয়া দেন তবে তাঁহার বিশেষ উপকার হইবে। পথের মধ্যে অঙ্কুরাগ্র দলিত হইয়া গাছগুলি মরিয়া না যায় সে জন্য প্যাকবাক্সে শিকড় সমেত গাছগুলি মাটিতে বসাইয়া তাহার উপরে খাঁচার আবরণ দেওয়া আবশ্যক হইবে। আপাতত প্রায় ২০/২৫টি গাছ তাঁহার প্রয়োজন হইবে। পরীক্ষার উপদ্রবে এ গাছগুলি মারা গেলে অন্য তাজা গাছের পুনশ্চ প্রয়োজন হইবে— তখন মহারাজ পুনর্ব্বার আদেশ করিয়া দিবেন। কলিকাতার নিকটে এই গাছের সন্ধান করিয়া না পাওয়াতে তাঁহার পরীক্ষা অসমাপ্ত হইয়া আছে। ... ইতি ২রা আষাঢ় ১৩১২

চিরানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* রবীন্দ্রনাথের এই পত্রটি ১৩৬০ শারদীয় দেশ সংখ্যা 'ত্রিপুরার কথা' পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ত্রিপুরার মহারাজকে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রটি লিখেছিলেন।

... বিধাতা দেশ থেকে আমাদের তাড়া করেছিলেন এই জন্যে যে, মহাবিশ্বের পথকেই আমরা দেশ বলে গ্রহণ করব। এই জন্যে যে, আমরা আরামে থাক্‌ব না আমরা আলোকে বাস করব—আমাদের জন্যে সম্পদ নয়, মুক্তি। যাই হোক্ আমি বেশ দেখতে পাচ্চি বাংলাদেশের বৈরাগীরা বিশ্বের পথে পথে ছড়িয়ে পড়বে— কোণের মধ্যে আমাদের জায়গা হবে না। ঐ দেখনা, এত কোণ এত বন্ধনের মধ্যেও জগদীশ বোস্‌কে কেউ ধরে রাখতে পারলে না। তাঁর বিজ্ঞানের মন্ত্র কুণো বিজ্ঞানের মন্ত্র নয়— তিনি জড় ও চেতন, বস্তুবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান সমস্তকে একত্র মিলিয়ে বন্ধনমুক্ত জ্ঞানের মহাসঙ্কীর্ত্তন পূর্ব্ব পশ্চিমে ধ্বনিত করে তুলেচেন। এই যে তিনি দ্বার খুলে বেরিয়েচেন এ দ্বার সহজে আর বন্ধ হবে না, তাঁর দলের লোক আরো আসচে, পথে আর জায়গা হবে না। ইতিমধ্যে এক পয়সা দু পয়সার সাময়িক ও অসাময়িক পত্রগুলো কুণো-রাজ্যের দলাদলি নিয়ে কোঁদল করুক চীৎকার করুক, সে কারো কানে পৌছবে না— কেননা বাংলাদেশের অন্তরতম সাধনলোকে সিদ্ধিদাতার আহ্বান এসে পৌচেছে। ... ১০ই কার্ত্তিক ১৩২৩*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* পুত্র বথীন্দ্রনাথকে লেখা ববীন্দ্রনাথেব চিঠিপত্র গ্রন্থেব দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত বযেছে।

পরিশিষ্ট-চার

[রবীন্দ্রনাথকে লেখা রমেশদত্ত ও সিস্টার নিবেদিতার পত্র। এ অংশের পত্রাবলীতে জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে]

54 Parliament Street
London, S. W.
16 July 1901

My dear Robi,

I was glad to learn that some of our countrymen have been thinking of making arrangements to make Dr. Bose independent of the Government appointment which he holds, so that he may pursue his researches all his life to the credit and honour of our country. The idea is an excellent one, because the change we have now will probably never return within a generation, if we lose it now. Dr. Bose has read startling papers and disclosed startling discoveries at the Royal Institution & the Royal Society, he has awakened the interest of the civilised and scientific world, and he is on the eve of revealing further truths which will give our countrymen a position and a name. But to pursue his work to a successful termination against all opposition is a work of years,— and during these years we must support him and keep him in his work. The Indian Govt. can't do this and won't do this. They have refused his prayer for extention, and you know as well as I, they will not be sorry to see him withdrawn from his brilliant labours into the drudgery and obscurity of Calcutta. If ever there was an occasion for us to fight for our fame and honour,—this is the occasion !

I am sure you will be able to guess, as well as I, what his expenses here are likely to be. He has to keep an assistant on about £ 200 a year, his instruments and appliances will cost about as much, and living with his wife in this country & travelling from place to place,—to Germany or America sometimes,—will cost at least £ 600 a year.

Thus a thousand pounds a year,—(or 15,000 Rupees) is what is absolutely necessary for him ;— I believe Sir M. Bhownagree gets about three times as much for his political work ! Will our country fail to give our only scientist this support when so much is at stake, when a chance now lost may never come back to us?

From past bitter experience, I would not depend on annual collections and countributions. As a friend, I would not advise Dr. Bose to give up his appointment,—miserable as it is,—depending on annual remittances. We must make him independent once for all, so that there may be no doubt as to his future, so that he may devote his whole time and energies to his work without any uncertainty in his prospects. I do not know how much money an Insurance Office would require in order to grant Dr. Bose an annuity of Rs 15,000 a year for the rest of his life. I imagine they would want two lakhs or so ;—and unless we can find this sum and pay it into an Insurance Office to assure an annuity to Dr. Bose during the rest of his life. I see no other way of making him independent of that drudgery, humiliation and eternal worry which are certain to ruin his chances and our country's prospects for ever.

The suggestions I have made in this letter are all my own. I feel strongly in the matter, and have thought it out, and made my own calculations. And I feel also that if we do not help ourselves in this matter, if we have not patriotism enough to make our one scientist independent for life and devoted to the cause of science and of our country,—we shall lose our chance for ever and deserve to lose it. I know, Robi, you feel as strongly as I do ; you have immense influence in the country ; and I appeal therefore to you to try privately to raise this money & invest it in the manner proposed for the honour & the glory of our country.

Yours Ever Sincerely
Romesh Dutt

Bose Para Lane
Baghbazar
Calcutta. Friday
June 16, 1899.

My dear Mr. Tagore.

You have heard long ago, I fancy, that I must go to England this summer & that therefore I shall not be able to accept that fascinating invitation to your river-house, towards wh. I had been steadily pressing for so long! I was within a day or two of writing to you that, if you wd. allow me, I wd. come to Mrs. Tegore & yourself as soon as the Swami had started. Little did I think that before I shd. have written, my own fate wd. have been reversed !

I am really not at all happy to be going away from India—even for a little while—and long talks with yourself on all sorts of delightful things are amongst the many disappointments of the change of plan. Besides, I really wanted to add a new friend to those with which India has already blessed me, and you are so dear to my friend Dr. Bose, that I cd. not help hoping you sd. be my friend too !

But I hope that the greatest ends may be better served by my going than by my staying—& if that is so I know that you will feel with me that personal considerations simply do not count.

My Au Revoir includes a great many wishes for your good health & happiness until we meet again. Please give my kind regards and respects to Mrs. Tagore & my love to your Charming Children.

And believe me dear Mr. Tagore.

Sincerely Yours,
Nivedita

9, Elysium Row,
Calcutta.
April 18th, 1903.

Dear Mr. Tagore,

You asked me to write you an account of the actual discoveries which Prof. Bose had made, & of the difficulties under which he had laboured in making them. But I imagine that you only want the kind of account that I can give you in a letter. I imagine, too, that in writing you a letter I am making a more of less confidential communication, so that I need not fear to use names occasionally knowing that I shall not be quoted in any public way.

When I came to Calcutta I first knew Prof. & Mrs. Bose, in the end of the year 1898. I was horrified to find the way in which a great worker could be subjected to continuous annoyances & petty difficulties—with the evident earnest desire of those who were about him to end his distinction which was personally galling to them. The college-routine was made as arduous as possible for him, so that he could not have the time he needed for investigation. And every little thing that happened was made an excuse for irritating correspondebce & flagrant misrepresentation.

These things may seem small in your eyes, but if you have the least idea (as you must have) of how impossible it is to do work requiring great insight or great & sustained emotion, unless there is freedom & peace, you will know how wonderful it is that our friend should have continued to work on & achieve, in spite of his surroundings at that time. If one could also realise, in a country situated as India is, the sacrifices that a free people, like the Americans or English, the French or the Germans wd. be willing to make in order to obtain such a worker as Dr. Bose—of their own blood—one wd. stand amazed, as I did, at the spectacle of a great scientific man working alone as he was. I had come, of course, from Europe, where Prof. Bose's name was well known as the discoverer of the Etheric Waves that penetrate minerals. His work was belated in reaching Europe. It was announced along with the Rontgen rays, & obviously went deeper—since that form of light was deterred by bone & metal, while his penetrated these substances. Already, early in the year 1895, I believe, he had demonstrated the existence of these invisible rays at the Town Hall, Calcutta—and it was not till two years after he had thus made the essential discovery—as some of the Italian scientific papers were the first to point out,—that Marconi began to work out & apply it on thr large scale.

Of course you understand that men of the inventor & discoverer type—men like Marconi, Tesla, Mascine, & so on,—rank in the world of science far below the investigator, the man of Sannyasin mind like Dr. Bose, who pursues knowledge for its own sake. Even Prof. ... jeopardises his great reputation, & certainly minimises his historic importance by taking patents & becoming involved in commercial schemes. But Dr. Bose not only demonstrated the existence of these particular etheric waves. He proved himself as great in constructive ability as in reseach itself, & his instrument, popularly known as the Artificial Eye, was considered a marvel of compactness & simplicity. Prince Kropotkin was talking of how Prof. Thomson the week before at the Royal Institn. had exhibited an apparatus some yards long, to act as a polariser of light—and Prof. Bose, the following week, to do the same thing, simply took up a book (it happened to be a Bradshaw) & showed how the rays wd. pass one way & not the other. "I said to myself", said Prince K, "that this was the simplicity of the highest genius." But of course Prof. Bose was only able to perform this great simplification of methods because his theory was so much more sound than those of his English & German competitors in this field.

He began to publish Papers through the Royal Sociaty in, I think, the year 1894. From that date, working under all his difficulties as he was, he published 2 or 3 every year till he left for Paris in 1900. (One Paper in 2 years is considered a good record for a life that is surrounded by advantages.) And Prof. Bose's work was in each case completely original & in a special sense accurate & exhaustive. He was like a man haunted by the fear that if he failed at any point his people wd. be held to have no right to education. "Everyone knows that we have brilliant imagination" he told me, when he was fighting against death in London in 1900, & still struggling to make a record of his latest discoveries, "but I have to prove that we have accuracy & dogged persistence besides." He did prove it. Lord Rayleigh & Sir Wm. Crookes both told him that while the perfection of his methods was unquestioned, no one had yet been able, in 1901, to repeat his experiments of 1895-6! His manipulation was beyond rivalry.

The work of '94 to 1900 had consisted of some dozen or more separate investigations on invisible light-polarisation. The existence of a dark cross—&c. &c.—these were valuable pieces of work, full of suggestions to some of the advanced workers in Europe, who were not slow to take hints from his instruments & theories. It was apparently in the year 1900, however, that all these separated tasks began to combine in a series of great generalisations which have not yet been given to the world in their completeness, and which are to prove of wider & wider philosophic interest as time goes on.

I allude to the great Theory of Stress & Strain—which, if only he can command time & strength to work it out in publication, will be held as epoch-making as Newton's Law of Gravitation—a tribute worthy of India's contributing to world-knowledge.

It is the minor applications of this generalisation that have hitherto attracted so much attention—one of the first discoveries to which it led was that of the Binocular Alternation of Vision.

Another was of a more practical (i.e. commercial) nature—leading to the improvemrnt of the coherer in Wireless Signalling, & Lodge's collaborator, Dr. Muirhead, freely confessed that in the development of the system lately adopted for India, they had owed most important suggestions to Dr. Bose's Papers & conversation. The largest applications of the theory are however purely scientific. It gives an immediate clue to whole classes of apparent anomalies in photography, in chemistry, & in Molecular Physics generally. Amongst other things it led to the immediate discovery and formulation of the phenomenon known as Vegetable Response. In realms like these it has disproved the contentions of many would-be theorists of a smaller scale, & there is therefore a strong opposition to Prof. Bose's work amongst those physiologists who have tried to prove the unique character of life. This opposition is of course perfectly normal. It is usually in fighting against it, that a scientific man proves his greatness, & conquers those who disagree with him. But in this case, there is a strong race-feeling of jealousy to combine with the natural & necessary scientific opposition, & I have no doubt that it was through the efforts of these men at the India Office that the opportunity was taken to refuse Dr. Bose any extension of deputation, at the moment when his opinions began to be known, & before his book had yet come out.

It was the very man of whom I have this suspicion who in November, believing Prof. Bose. to be in India, (to have been forced back to India indeed) stole some of his results & published them as his own. Fortunately Prof. Bose's position in the world of Science was too well assured for him to touch it, & though he has been able to organise a small party, we may regard it as easily discredited if the work can only be continued in an adequate way.

The book on Response in Living & Non-Living is now triumphant. I want a far greater work, such as only this Indian man of science is capable of writing, on Molecular Physics,— a book in which that same great Indian mind that surveyed all human knowledge in the era of the Upanishads & pronounced it one, shall again survey the vast accumulations of physical phenomena which the 19th Century has observed & collected, & demonstrated to the empirical, machine-worshipping, gold-seeking mind of the West that these also are One—appearing as Many.

But I recognise that under present conditions one cannot even ask for the beginning of such a work. The petty daily persecution where perfect sympathy & every facility are absolutely necessary : the distracting routine of a paid servnant who is never allowed to feel independent of daily bread, the constant difficulties thrown in the way by minor officials who have power enough to impede, but not enough to be raised above jealousy,—are these things not enough? And then we ask him to undertake great work—but what are we willing to do for him? Can we supply him with companions in learning who will stimulate & encourage the arduous work? Does it trouble us that he is the one man in India doing work of the first rank, & that to this day he is paid less than any Englishman, even the commonest, wd. recevie in his place?

Dr. Garnett of London told me of the splendour of the great College of Science at Vienna, and how, when he exclaimed as to its cost, the government representative replied proudly that if one scientific man shd. be produced in a century there, it wd. be more than worth their while. Which of us feels like this?

Ah India ! India ! Can you not give enough freedom to one of the greatest of your sons to enable him,—not to sit at ease, but—to go out & fight your battles where the fire is hottest & the labour most intense, and the contest raging thickest ? And if you cannot do this—if you cannot even bless your own child & send him out equipped, then,—is it worthwhile that the doom should be averted, & the hand of ruin stayed, from this unhappy & so-beloved land ?

This is all very inadequate, dear Mr. Tagore. But I have used many sheets of note-paper I see—& I must draw my letter to a close.

Ever yours faithfully
Nivedita
of Ramakrishna-V